শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, বা পাণ্ডবদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাস শেষে হস্তিনাপুরে ফেরা, অথবা ভগবান বিষ্ণুর বামন অবতারের রূপ ধারণ করার দিনটি – যা স্মরণ করেই হোক, আদিকাল থেকেই দীপাবলি উৎসবটি বৃহত্তর ভারতবর্ষে পালিত হয়ে আসছে। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য শকারি হবার পরও দীপাবলি পালিত হয়েছিল এবং অমৃতসরে স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনও হয়েছিল এই দিনটিতেই। তাই দীপাবলি উৎসবটি ভারতের প্রথাগত ঐক্যের এক বলিষ্ঠ প্রমাণ...

মাসিক ই-পত্রিকা

কলম হাতে

শুভ্র নাগ, দীপঙ্কর সরকার, অমিত নাগ, সরজিত মন্ডল, সমীর দাস, ডাঃ অমিত চৌধুরী, অনিমেষ ভট্টাচার্য, অমিত সাহা, অসিত চট্টোপাধ্যায়, রিয়া মিত্র, দোলা ভট্টাচার্য এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

বর্ষ ২, সংখ্যা ৬
নভেম্বর ২০২০

ভূত চতুর্দশী সংখ্যা

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"ভালবাসা মানেই কেবলই যাওয়া
যেখানেই থাকি না কেন
উঠে পড়া
পেয়ে গেলে নিকটতম যান।"

(ব্যক্তিগত নক্ষত্রমালা - সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়)

শ্রী ৺সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

জন্মঃ ১৯ ০১ ১৯৩৫ ☐ মহাপ্রয়াণঃ ১৫ ১১ ২০২০

Photographer: Biswarup Ganguly

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soumitra_Chatterjee_-_Kolkata_2011-05-09_2865.JPG

শ্রদ্ধাঞ্জলী

ভালবাসার আরেক নাম হলো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি বাংলা ভাষা তথা বাংলা- শিল্পকে আপন করে নিয়ে সৌহার্দের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন তাঁর সৃজনশীল কর্ম সাধনাকে। উনি সত্যজিৎ রায়ের ক্ষুরধার দৃষ্টিতে ছিলেন একাধারে অপু আবার ফেলুদা। অপু থেকে ওনার অভিনয় জগতে পথ চলা শুরু। তবে কি শুধুই অভিনয়... তার পাশাপাশি উনি ছিলেন কবি, বাচিক শিল্পী, নাট্যকার ও সম্পাদক।

বাংলা শিল্পজগতের শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসায় উনি চিরকাল অমর শিল্পী হয়েই অধিষ্ঠান করবেন। ফেলুদা বলতেন, "অভিনয় আর সাহিত্যপাঠ এক বইয়ের দুই মলাট — সাহিত্যের রসবোধ যেমন অভিনয় সত্তাকে জারিত করে, অপরদিকে অভিনয়ের চারিত্রিক দৃঢ়তার কাঠামো সাহিত্যের পরিমণ্ডল রচনা করে।"

স্বনামধন্য, স্বর্ণশিল্পীর সাথে আর 'হঠাৎ দেখা' হবে না কোন স্থানে। তবে রাতের সকল তারার মতো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও দিনের আলোর গভীরে রইবেন চির উজ্জ্বল, অপ্রতিভ এবং অপরাজিত হয়ে। ■

বিনীতা — রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

যে আসে, জানি নিষ্ঠুর কালের নিয়মে তাকেই যেতে হয়, তবুও অবুঝ মন কারও কারও যাওয়াকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা। এই বিদায়ের ব্যথা, মোদের হৃদয়ে চিরতরে রইবে গাঁথা... ■

বিনীত — প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

কলম হাতে
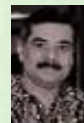
কলম হাতে

পাঠকের দরবার

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, সাহিত্যিক

বইয়ের সমালোচক হতে হলে পড়তে হয় অনেক বই। শুধু পড়া নয়, তা মনে রাখাটাও সমান জরুরি। আমি পুস্তক সমালোচক নই, তবে পাত পেরে খেতে বসে পঞ্চ-ব্যঞ্জনের কোনটাতে লবণ কম, কোন আলু ঠিক মতো সেদ্ধ হয়নি, ডাল কেন পাতলা, চাটনিটা ফাটাফাটি এমনতো বলতেই পারি। আর সেটুকু মাথায় রেখেই অক্টোবর মাসের 'গুঞ্জন' পড়ে নবীন ও প্রবীণ লেখকদের কার লেখা কেমন লাগলো তা জানানোর চেষ্টা করলাম।

প্রথমেই আসি প্রচ্ছদে — রোগগ্রস্ত ২০২০র বিদায় শুধুই সময়ের অপেক্ষা। নানা কারণে অক্টোবর সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। এই অতিমারীর সময়ে যে এখনো নিয়মিত এটা প্রকাশিত হচ্ছে সেটাই অনেক। প্রচ্ছদটি বড়ই সময়োপযোগী ও সাথে সম্পাদকীয়টির জন্য সম্পাদিকার অবশ্যই প্রশংসা কাম্য।

ছবির আমি "ছ" বুঝি না। তবে যা বুঝি সেটা বলতে গেলে ১১ বছরের কুমারী রিত্বিকা চ্যাটার্জির চিন্তাধারা সত্যিই প্রশংসনীয়। আবার অবাক হয়েছি শ্রীমান অর্ঘ্যদীপ সেনগুপ্তের আঁকা দেখে, কি অপূর্ব রংয়ের ব্যবহার এবং আঁকার ধরণও চমৎকার।

শ্রী তাপস কুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের 'বিদ্যাসাগর' লেখাটি অসাধারণ।

শ্রী বিজয় নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের "কোভিড ১৯ ও আমরা" প্রতিবেদনটি খুবই সময়োপযোগী। ওনার লেখার ধরণ বলছে ওনার কাছ থেকে আগামী দিনেতে অনেক কিছু পাওয়ার

আছে। ওনার আরো লেখা পড়ার ইচ্ছে রইলো।

শামীমা খাতুনের কবিতাটি বেশ ভালো।

ডাঃ অমিত চৌধুরী মহাশয়ের "শিব দুহিতা নর্মদা" ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনীটির জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতাম, তা যেন হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেলো, খিদে মিটলো না।

শ্রী দীপঙ্কর সরকার মহাশয়ের ধারাবাহিক "শিকড় (গাঁ গেরামের গল্প)" লেখাটি অসাধারণ। গ্রামের লোকের সরলতার মতো তাঁর লেখাতেও যেন সেই সরলতা বিদ্যমান।

শ্রী সন্দীপ বাগের লেখাটি বেশ।

স্বাগতা পাঠকের ধারাবাহিক "শেষ রাতের মরীচিকা" মন্দ নয়।

শ্রী প্রণব কুমার বসু মহাশয়ের "রাজস্ব" শুধু অনবদ্য বললে ভুল হবে, প্রাসঙ্গিকও।

রাজশ্রী দত্তের "চার ঋতু — অধ্যায়" এর পরের পর্বের জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

শ্রী প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "হ্যাঁ গো, গলত হ্যায়" অনবদ্য ।

শ্রী অমিত নাগ মহাশয়ের "মটন প্যাটিস এবং স্কোয়ার চিকেন" টানটান লেখা, বেশ ভালো লেগেছে।

শ্রী অনির্বান বিশ্বাস মহাশয়ের "ভুলুবাবু" লেখাটি বেশ ভালো লেগেছে।

শ্রেয়সী পাঁজার দীর্ঘ কবিতা "অনামিকা" সুন্দর লেখা।

বাংলাদেশের জনাব শামসুদ্দিন শিশির মহাশয়ের "মনে পড়ে" লেখাটি থেকে একেবারে মাটির ঘ্রাণ উঠে আসছে। অপূর্ব লেখা। আগামী দিনেতে লেখকের আরো লেখা পড়তে চাই। ■

মহাকাল

আলোকচিত্র গ্রহণঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

হিন্দুধর্ম অনুযায়ী মহাকাল ব্রহ্মাণ্ডের চূড়ান্ত সংহারকর্তা শিবের বিধ্বংসী রূপ। মহাকাল পুরুষ, নারী, শিশু, জীবজন্তু, বিশ্বচরাচর ও সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে কোনোরকম অনুকম্পা ছাড়াই পূর্ণ ধ্বংসে লিপ্ত হন। কারণ তিনি হলেন কাল বা সময় অর্থাৎ মহাকাল। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার নবারুণ সঙ্ঘে কালী পূজার দিন মহাকাল এইরূপে পূজিত হন।

ছবির নামঃ কৌশিকী কালী

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১১ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

বন্যা

মৌসুমী চ্যাটার্জী

মার খোলা হাসিটা আছড়ে পড়ে আমার
জানলায়;
ঝন ঝন শব্দে
তোমাকে রেখে এসেছিলাম কেদারনাথে মন্দাকিনির তীরে।
ধোঁয়া ওঠা কাপে যখন মিশে যাচ্ছে বরফ কুচি;
কী খিলখিল হাসি তোমার!

টুপুস করে এক কুচি বরফ পড়ল কাপে...
মাফলারখানা এলোমেলো উড়ছিল, উত্তরের ঠান্ডা হাওয়ায়;
তুমি রয়ে গেল ওখানেই পাহাড়ের সাধন সঙ্গিনী হয়ে,
কিছুতেই বাড়ি ফেরাতে পারলাম না।
কষ্ট হয়েছিল প্রথমে খুব...
কিন্তু এখন আনন্দ হয় মাঝে মাঝে...
হেমন্তের বেলাগাম হাওয়া হয়ে তুমি ফিরে ফিরে আসো।
পর্দা উড়তে থাকে, উড়তেই থাকে,
মাঝরাতে কাঁপুনি দেয়।
তবু জানলা বন্ধ করতে পারি না।

ছাদে উঠি পূর্ণিমার রাতে।
তোমার হাত ধরে পাহাড়ি জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই।

অভিলাষ

আমার বোকা বোকা কথা শুনেও কী নির্মল হাসি তোমার!
বড্ড আগলে রাখতে ইচ্ছে করে।
বড্ড বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে;
নাহলে আমি মরে যাব যে!
পাইন এর ফাঁকে ফাঁকে লম্বা লম্বা রোদ এসে পড়ে;
বিদেশি ছবির মতো!

তোমাকে আমি সেই বিদেশি ছবির মতোই
ভালোবাসতে চাই!
চাই ভালোলাগায় ভরিয়ে দিতে।

হবে বন্যা? তুমি থাকবে ভারত সেবাশ্রমের সেই পুরোনো স্যাঁতস্যাঁতে ঘরখানায়?
আমার সারাজীবনের উচিত কর্মের তালিকা শেষে?

আমি ঐ পাহাড়ের গন্ধ নিতে চাই বন্যা!
একবার পূর্ণতা পেতে চাই! তোমার সাথে। ■

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

তৃতীয় পর্যায় (১)

“আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছো
আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে
নিজে এসে ধরা দিয়েছো...”

২২শে জুন রবিবার দুপুর একটা জব্বলপুরের ট্রেন ধরলাম, কাকাজী, আমি, আর এবারের নূতন সঙ্গী অশোক দাস। খুব গরম, ট্রেনে একটি পরিবারের সাথে পরিচয় হল। দু'টো ছোট ছেলে-মেয়ে। খুব দুষ্টু। সোমবার দুপুর তিনটের সময় জব্বলপুর এলাম। ভরা দুপুর। ওই ছেলটি নাম সঞ্জয় পাল আমাদের নিয়ে যাবেই ওদের বাড়ি। কিন্তু আমাদের তো সময় কম তাই ফেরার সময় দেখা করার চেষ্টা করবো বলে রেহাই পেলাম। আমাদের এবারের লক্ষ্য ঝাঁসি। জব্বলপুর থেকে ট্রেনে করে এলাম ভিটুনি, ওখান থেকে ঝাঁসি। বাঁকেবিহারী মহারাজ আর মাতাজী দেখেই চিনতে পারলেন।

সন্ধ্যা বেলায় নর্মদার ঘাটে গিয়ে আরতি করে আবার সঙ্কল্প করে নিলাম। আশ্রমে ফিরে এলাম। মাতাজী রাতের খাবার দিলেন। বেশি রাত না করে শুয়ে পড়তে বললেন।

আমরাও তাঁর আদেশ মেনে নিলাম। গত পরশু বুদ্ধপূর্ণিমা গেছে, আজ দ্বিতীয়া। চাঁদ তার স্বমহিমায় উজ্জ্বল। নদীর পাড়ে হলে কি হবে, একটুও হাওয়া নেই, ভীষণ গরম। কাকাজী আর অশোকবাবু নিজেদের মধ্যে নাক ডাকার প্রতিযোগিতা করছেন। ক্লান্তি আর গরম, তাই ঘুম আসছে না। সাথে ওঁদের প্রতিযোগিতা। জ্যোৎস্না অকৃপণভাবে তার মুগ্ধতা দান করে চলেছে, বাইশ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে আছি, তাই লরি যাওয়ার বিরাম নেই। ভাবছি সপ্তকল্প জয়ী ঋষি মার্কণ্ডেয়র কথা। মহাভারতের বনপর্বে নর্মদা পরিক্রমার কথা বলা আছে। বহু যুগ পরে রানি অহল্যাবাঈ আবার নর্মদার প্রচার করেন। তারপরেও কেটে গেছে অনেক বছর। কলকাতা থেকে আমরা আসছি, আরও অনেক লোক আসছেন, আসবেন। কিন্তু কিসের আকর্ষণে!

মায়ের টান তো আছেই, সেই সঙ্গে প্রত্যেক ঘাটে ঘাটে মায়ের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি অনুভব করার ইচ্ছা। বিভিন্নভাবে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে মাকে দেখার বাসনা নিয়ে এই গরমকে উপেক্ষা করেই চলে এসেছি। হঠাৎ চোখের ওপর টর্চএর আলো পড়াতে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। দেখি কাকাজী আর অশোকবাবু প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে চলেছেন। আমিও ওঁদের অনুসরণ করলাম।

মাতাজী চা খেয়ে যেতে বললেন। আজ মঙ্গলবার ২৪ শে জুন ভোর পাঁচটার সময় চলা শুরু করলাম। সূর্যের তাপ বারার আগে যতটা এগিয়ে যাওয়া যায়। মহারাজ আর

নমামি দেবী নর্মদে

মাতাজী আমাদের পথ নির্দেশ দিয়ে বিদায় দিলেন।

রাস্তার দু'পাশে আখের চাষ, গম এবং অন্যান্য সবজি চাষ দেখলাম। ফসল ভালই হয়েছে। আমরা চারজন তৃতীয়বার পরিক্রমার জন্য বেড়িয়েছি। কিছু দূর যাবার পর রুক্ষ শুস্ক মাঠ দেখলাম। এটা আবার অন্য রূপ। আমরা হেঁটে চলেছি। অশোকবাবু নেট দেখে রাস্তার যে ধারণা করে এসেছিলেন তার সাথে সবটা মিলছে না, তাই উনি কিছুটা উত্তেজিতও। এই নর্মদা পরিক্রমার সময় কোন আগাম হিসাব চলে না। পরিক্রমার সব পথই শেষ হয় ওঙ্কারেশ্বরে। ওঙ্কারেশ্বরের মাথায় সঙ্কল্পের জল ঢালার পর পথের শেষ। তাই অতো ভেবে কি হবে? সূর্য্যদেব তাঁর তাপ অকরুণ ভাবে আমাদের ওপর দিয়ে চলেছেন। সাথে বিখ্যাত লু।

এলাম একটি শহরে নাম গোটগাও। মাত্র সকাল দশটা, এরই মধ্যে রাস্তায় হাঁটা যাচ্ছে না। একটা দুর্গা মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। পুরোহিত পূজা করছিলেন। পরে আমাদের সাথে কথা বললেন। বাড়িতে নিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাঙালি মাছ খাই, তাই আর বললেন না, মন্দিরেই খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আর বললেন বিকাল চারটের আগে যেন না বেড়াই। বিকালে এসে চা খাওয়াবেন। আমরা যে যার মত করে শুয়ে পড়লাম মন্দিরের মধ্যে, কিন্তু বাইরের গরম বাতাস আসছে। সময় কাটছে না। দুপুর তিনটের সময় বেড়িয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছে গরম শিক মাথার মধ্যে ঢুকছে। গামছা ভিজিয়ে মাথায় দিলেও নিমেষে শুকিয়ে

Photo Details: Narmada River at Bhedaghat in Jabalpur, India... (চিত্র পরিচয়ঃ ভারতের জব্বলপুরের ভেদাঘাটে নর্মদা নদী...)

Photographer: Aksveer (আলোকচিত্র গ্রহণেঃ অক্সভীর)

Source:

https://en.wikipedia.org/wiki/Narmada_River#/media/File:Narmada_River_Jabalpur_India.jpg

যাচ্ছে। বেশ কিছুটা চলে যাবার পড়ে দিব্যানন্দজীর মনে হল ভুল পথে এসেছি। দু'কিলোমিটার এসে গেছি, কাকাজী খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বুঝতে পারছি গরমেই এটা হচ্ছে। কিন্তু কিছু করারও তো নেই। খামোকা চার কিলোমিটার হাঁটার রাগ কাকাজীর আর যাচ্ছে না। সঠিক পথের সন্ধান গুরুর কৃপা ছাড়া পাওয়া যায় না, কত জন্ম লেগে যায়, তার ঠিক নেই, এখানে রাগ করে কি হবে। যাই

হোক, নুতন করে চলা শুরু করলাম। কিছুটা গিয়ে দেখি গরু-ছাগলের হাট।

পাশের চায়ের দোকান থেকে আমাদের চা সিঙ্গারা খাবার জন্য ডাকছে, কিন্তু গরমে ভাল লাগছে না, তাই নর্মদে হর বলে এগিয়ে গেলাম। শুধু ঠাণ্ডা জল খেতে ইচ্ছে করছে। দোকানদার দুঃখ পাবে বলে দিব্যানন্দজী সিঙ্গারা নিয়েছেন, এবং অশোকবাবুর সাথে ভাগ করে নিলেন। আনন্দে দিব্যানন্দজী গান ধরেছেন, আমার মনে হচ্ছে সূর্যদেব বলছেন 'মা-রে-গা।' আমার লু লেগে গেছে।

প্রায় সাত কিলোমিটার হাঁটা হয়ে গেল। একটা চায়ের দোকানে বিশ্রাম নিচ্ছি, একজন মহারাজ এসে বসলেন, প্রায় জোর করেই চা খাওয়ালেন। আমাদের অবস্থা দেখে আরোও দু'কিলোমিটার দূরে কামধ গ্রামে আসন পাতার কথা বললেন। আর কাল সকালে নর্মদার পাড়ে ওনার আশ্রমে যেতে অনুরোধ করলেন। চা খাইয়ে বিদায় নিলেন, আমরাও চললাম কামধ গ্রামে। জগদিশ্বরের মন্দিরে। আজকের মত যাত্রার বিরতি। মহারাজ স্নান করার পরামর্শ দিলেন এবং পাইপে করে মাথায় জল ঢালতে লাগলেন, বেশ কিছুক্ষণ পরে ধাতস্ত হলাম। খিচুড়ি খেয়ে মন্দিরের সামনেই শুলাম, খুব গরম সঙ্গে ক্লান্তি, ঘুম আসছে না। মশারা অতিথি সেবার কোনো ত্রুটি করেনি। সারারাত আমাদের সঙ্গ দিয়েছে গান শুনিয়ে।

নর্মদে হর।

...ক্রমশ ■

শ্যামা মা

ছবির নামঃ শ্রীময়ী শ্যামা

শিল্পীঃ অর্ঘ্যদীপ সেনগুপ্ত ✧ বয়সঃ ২০ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

শিকড় (গাঁ গেরামের গপ্পো)

দাদুর বাংলাদেশে আগমন

(৪র্থ পর্ব)

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

পরের দিন খুব সকালে দাদুর ঘুম ভাঙলো। আমার অত সকালে ওঠার অভ্যাস নেই, তবুও উঠতেই হলো। তড়িঘড়ি করে ঘুম থেকে উঠে দেখি দাদু রেডি হয়ে বসে আছেন। দাদু বললেন, "বুঝলে দীপুদা শরীরের নাম মহাশয়; যত আরাম দেবে সে তত আরাম চাইবে। তার চেয়ে অত দূর থেকে এসেছি যখন তখন সবটাই দেখে যাব।" দাদু এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। আমাকেও তড়িঘড়ি করে রেডি হতে হলো। দু'জনে মিলে প্ল্যান করলাম ব্রেকফাস্ট করে নাটোরে যাব। দেখবো নাটোরের দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ি তথা উত্তরা গণভবন। সেদিনটা রাজশাহীতে থেকে পরের দিন সকালে ট্রেনে চেপে আমরা গ্রামের দিকে রওনা দেব। হোস্টেল থেকে নেমে সকালের খাবার খেলাম। তারপর বাসযোগে রওনা দিলাম নাটোরের উদ্দেশ্যে। নাটোর থেকে রাজশাহী প্রায় ঘন্টা খানেকের পথ। দুজনে যাচ্ছি বনলতার শহরে। এক অন্যরকম ভাল লাগা কাজ করছে। হাজার বছর ধরে আমরাও চলছি বনলতার শহরে; বনলতার টানে।

উৎস

নাটোর বাসস্ট্যান্ড থেকে অটো নিয়ে পৌঁছে গেলাম দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ি। দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ি বা উত্তরা গণ-ভবন আঠারো শতকে নির্মিত দিঘাপতিয়া মহারাজাদের বাসস্থান। বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিঘাপতিয়া রাজবাড়ীকে 'উত্তরা গণভবন' নাম দেন।

দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দয়ারাম রায় নাটোর রাজের রাজা রামজীবনের দেওয়ান ছিলেন। দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় (১৬৮০-১৭৬০) ১৭৩৪ সালে প্রায় ৪৩ একর জমির উপর দিঘাপতিয়া প্রাসাদের মূল অংশ ও এর সংলগ্ন কিছু ভবন নির্মাণ করেন। রাজবংশের ষষ্ঠ রাজা প্রমদানাথ রায়ের আমলে ১৮৯৭ সালের ১০ই জুন নাটোরের ডোমপাড়া মাঠে তিন দিনব্যাপী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের এক অধিবেশনের আয়োজন হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি সেই অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

জাদুঘরে প্রবেশের পূর্বে টিকিট কাটতে গিয়ে আমার চোখ কপালে উঠলো। বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রবেশমূল্য বিশ টাকা কিন্তু বিদেশিদের প্রবেশমূল্য দুইশত টাকা। দাদু আফসোস করে বললেন, "এমনই দুর্ভাগা আমি নিজের দেশেও পরবাসী সেজে থাকতে হচ্ছে দীপুদা। কাঁটাতার এক বিভেদের প্রাচীর তুলে দিয়েছে। এই আলো,

উৎস

হাওয়া-বাতাস সবই আমার তবুও কে যেন প্রতিমুহূর্তে আমাকে এসবের থেকে আলাদা করতে চাইছে। আমি যে একজন বিদেশি সেটাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এক জাতি, ভাষা এক; সংস্কৃতি এক তবুও আলাদা একটা মানচিত্রে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হচ্ছে কেন বলতে পারো দীপুদা!" আমি কেবল শুনে গেলাম দাদুর আক্ষেপগুলো। দাদু আরও বললেন, "নাটোর মানেই আমার কাছে বনলতা সেন আর জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দ দাশ কার বলতে পারো? তিনি কোন বাংলার?" দরাজ গলায় দাদু আবৃত্তি করলেন জীবনানন্দ দাশের কবিতাঃ

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই - প্রীতি নেই - করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।"

বাঙালি হয়েও আমরা এ আঁধার দেখতে পাচ্ছি না। এমন দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই আমরা উত্তরা গণভবনে প্রবেশ করলাম। প্রাসাদের পিছন দিকে রয়েছে ফোয়ারাসহ একটি সুদৃশ্য

বাগান। বাগানের এক কোণে রয়েছে প্রমাণ আকৃতির মার্বেল পাথরের তৈরি একটি নারীমূর্তি। ১৯৪৭ সালের পর অবশ্য এ ভবনে আর কেউ বসবাস করেনি।

প্রাসাদের ভিতর বহু প্রাচীন ও দুর্লভ প্রজাতির গাছের সমাবেশ ও সমারোহ দেখতে পেলাম। ঢাকার জাতীয় স্মৃতিসৌধের শোভাবর্ধনকারী রোপণকৃত ফুল ব্রাউনিয়া ও ককেসিয়া এখানকারই। এছাড়া অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে এখানে আছে রাজ-অশোক, সৌরভী, পারিজাত, হাপাবমালি, কর্পূর, হরীতকী, যষ্টিমধু, মাধবী, তারাঝরা, মাইকাস, নীলমণিলতা, হৈমন্তীসহ বিভিন্ন দুর্লভ প্রজাতির ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষও চোখে পড়লো। প্রাসাদের মধ্যে পরিখা বা লেকের পাড়ে এসব বৃক্ষের মহাসমারোহে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ইতালীয় গার্ডেন উত্তরা গণভবনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অংশ। বাগানটির আসবাবপত্র রাজা দয়ারাম ইটালি থেকে আনিয়েছিলেন। ছিপ হাতে কালো রঙের মার্বেল পাথরের মূর্তিটি বেশ উপভোগ্য। বেঞ্চগুলো কলকাতা থেকে আনানো হয়েছিল। পাহাড়ি কন্যা পাথরের মূর্তিটির এক হাত ভাঙা। হাতের কবজিটি স্বর্ণ দিয়ে বাঁধাই করা ছিল।

উত্তরা গণভবন চত্বরে গোলপুকুর, পদ্মপুকুর, শ্যামসাগর, কাছারিপুকুর, কালীপুকুর, কেষ্টজির পুকুর নামে ছয়টি পুকুর রয়েছে। এছাড়া গণভবনের ভেতরের চারপাশে সুপ্রশস্ত পরিখা রয়েছে। প্রতিটি পুকুর পরিখায় শানবাঁধানো

চিত্র পরিচয়ঃ নাটোরের দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ি...

একাধিক ঘাট আছে। দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় পুকুরগুলো ভরাট হয়ে গিয়েছে। ঘাট ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। উত্তরা গণভবন ঘুরে আমরা নাটোরের বিখ্যাত কাঁচাগোল্লা খেলাম। তারপর রাজশাহীর পথে রওনা দিলাম। হাঁটতে হাঁটতে দাদু আবৃত্তি করে চলছেন...

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।"

...ক্রমশ ■
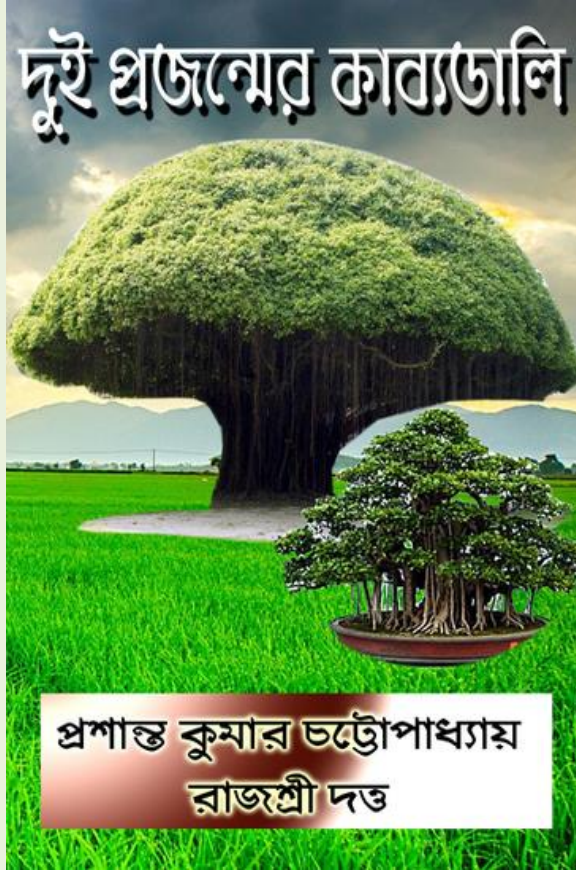
দুই প্রজন্মের কাব্যডালি
প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
রাজশ্রী দত্ত

ধারাবাহিক উপন্যাস

চার ঋতু-অধ্যায়

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(৪)

দীপাবলির রঙিন সন্ধ্যা, আলোক মাধুরীতে সেজে উঠেছে 'দ্য সিটি অফ জয় কলকাতা।' বড়ো বড়ো অট্টালিকা থেকে আলোর রঙিন মালা নেমে এসেছে রাস্তার আঙিনায়। আকাশ জুড়ে ঝিকিমিকি জোৎস্নার খেলা। অমা-রাত্রির বুকে যেন কেউ আনন্দের ক্যানভাস এঁকে দিচ্ছে আতস বাজির ঝর্ণাধারায়। সারা শহর যখন দীপাবলির আনন্দে মাতোয়ারা, তখন চেনা শহরকে পিছনে ফেলে অজানা পথের পেরিয়ে যাওয়ার শরিক হয়েছে দুই কপোত কপোতী।

কেটে গেছে ১০টা বছর। পিকু এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। এটাই শেষ বছর। এই দশটা বছরে জীবন অনেকটা বদলে গিয়েছে। শৈশব স্মৃতি এখন তার কাছে প্রায় কোন এক শোনা রূপকথার মতোই। পিকুর গায়ের রঙটা আগাগোড়াই চাপা। তবু ওই কালো রঙের মধ্যে যে একটা আলদা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, তা যে কোন নারীকেই আকর্ষিত করে। সে পড়াশুনাতেও মন্দ নয়, এখন ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম নিয়ে পড়াশুনা করছে। কলেজে পড়াকালীন

রোহিণীর সাথে বন্ধুত্ব। অবশেষে ধীরে ধীরে বন্ধুত্বের রসায়নটা বদলে প্রেম পর্যায়ে পরিণত হয়। রোহিণীর আবদার রাখতে তাকে নিয়ে দীপাবলির সন্ধ্যাটা নিভৃতে কাটাতে যায় শহর থেকে অনেকটা দূরে। অবশেষে তাদের বাইক এসে দাঁড়ালো একটা অজানা ঘাটের কাছে। বরাবরই প্রকৃতির সাথে পিকুর একটা আত্মিকটান আছে, সেই বৃন্দাবনে থাকাকালীন শিশুকাল থেকেই। হৈমন্তিক শীতল বাতাস বইছে, গঙ্গার ওপার থেকে ছুটে আসা আতস বাজিগুলো দূর আকাশ থেকে জলে তাদের প্রতিচ্ছবি এঁকে দিয়ে যাচ্ছে বারেবারে। পিকুর কাঁধে মাথা রেখে রোহিণী গুনগুন সুরে গান শুরু করল। পিকু রোহিণীকে গান গাইতে বললে রোহিণী কিন্তু তখন আর গান গাইতে চায়না। প্রতিবারই ও দেখেছে সেটা। পিকু কারণ জানতে চাইলে রোহিণী বলে, “এখনই সব শুনে নিলে পরে কিছুই বাকি থাকবে না।”

পিকু তখন হেসে বলে “বেশ আমার মরার সময়েই শুনিও।” রোহিণী এরপর রেগে যায়। অগত্যা রোহিণীর রাগ ভাঙাতে পিকুকেই শেষমেষ কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে হয়। আজও সে রোহিণীকে নিদারুণ রাগিয়ে দিয়েছে। রোহিণীর রাগ ভাঙাতে পিকু আবৃত্তি করতে শুরু করলঃ

“ তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি

শত রূপে শতবার

জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছি গীতহার,
কত রূপ ধরে পরেছ গলায়,
নিয়েছ যে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।...”

পিকুর কণ্ঠস্বরের মধ্যে বেশ একটা দরাজ ভাব আছে। পড়ার পাশাপাশি সে থিয়েটার-নাটক এসবের সাথেও যুক্ত আছে। তবে নব্বইয়ের দশকের মতো নাট্যজগত এখন আর নেই। সময় অনেকটাই পাল্টে গিয়েছে। এখন বেশির ভাগটাই ওয়েব সিরিজ। সবই প্রায় অনলাইন, গ্লোবাল নেটওয়ার্কিংএর মায়ায় আবিষ্ট। যাই হোক সময়ের সাথে সাথে সব কিছুরই পরিবর্তন হয়। কিন্তু তাতে শিল্পসত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না। যা থাকার তা আধুনিক ধায়ায়ও অক্ষুণ্ণ থাকে। পিকুর কবিতা শুনতে শুনতে রোহিণী হারিয়ে যায় অন্য এক জগতে। এই সময়ে পিকুর ফোনটা হঠাৎ বেজে ওঠে। কবিতা বলা থামিয়ে, সে ফোনটা ধরে। ফোনের ওপার থেকে কাঁদো কাঁদো গলায় পিকুর বোন বলে, “দাদা তুই এখনি বাড়ি আয়, সর্বনাশ হয়ে গেছে...” এই বলতে বলতে ফোনটা কেটে যায়। তারপর বারবার ফোন করেও আর ফোন পায়না পিকু...

...ক্রমশ ■

ভূত-ভবিষ্যৎ

প্রণব কুমার বসু

মিটিং হচ্ছে বিরাট বড়
অনেক ভূতে হচ্ছে জড়ো
মামদো ভূতের মামদোবাজি
জ্বালাবে সে আতস-বাজি
স্কন্ধকাটা চেঁচিয়ে বলে,
“দেখেছিস গলাটা গেল চলে”
গেছো-ভূতটা হাসছে বসে
দেখি কী হয় দিনের শেষে।
শাঁকচুন্নি এখন ব্যস্ত খুবই
পুকুরে দিলো একটা ডুবই
পেত্নিটা শুধু করে রান্না
অন্যের ছোঁয়া উনি খান্না
যুগ্ম সম্পাদক নন্দী-ভিঙ্গি
“খুশির খবর - চারদিকে ডেঙ্গি”
হাই-রাইসের ছাদটা আমাদের
বুকিং শুরু নতুন সেক্টরের
লাইফ-টাইম কমই এম আই
অনাদায়ে হবে স্কন্ধকাটাই। ■

https://www.facebook.com/groups/183364755538153

প্রবন্ধ

আশ্বিন কথা - তৈরি হও

শুভ্র নাগ

আমি ফিরে গিয়েছি - ফিরে গিয়েছি তোমাদের দেওয়া কলঙ্ক মাথায় নিয়ে - আমাকে অশুভ বলে চিহ্নিত করে এ বছর আমার উপস্থিতিতে তোমরা করোনি কোনো শুভকাজ। অথচ মনে করে দেখো আগের বছরগুলোতে এই তোমরাই আমাকে ঘিরে মেতে উঠতে উৎসবে - আমার উপস্থিতিতে তোমাদের ঘরে আহ্বান করতে গিরিনন্দিনীকে, তখন আমি আর তোমাদের উৎসব ছিলাম যেন একে অন্যের পরিপূরক। তাই প্রতিবারের মত প্রকৃতির নিয়মে এবারও আমি এসেছিলাম তোমাদের কাছে আমার সবকিছু নিয়ে, প্রতি বছরের মতো এবারও উজাড় করে দিয়েছিলাম আমার সৌন্দর্যের ডালি।

তোমাদের জন্যে নিজের হাতে কখনো নীলের বুকে এঁকেছি সাদাকালোর আলপনা, কখনো বা রামধনুর সাত রঙ মিশিয়ে তৈরী করেছি হাজারো রঙ — ছড়িয়ে দিয়েছি সারা আকাশ জুড়ে। আবার কখনো নীলাম্বরের বুকে অনাঘ্রাতা কিশোরী শুভ্রা কাদম্বিনীর ভালবাসার ছবি এঁকেছি বারবার। প্রতি বছরের মতই নবদূর্বাদলের মাথায় রেখেছি হাত — পরম স্নেহে তার কপালে পরিয়ে দিয়েছি শিশির

দিয়ে গড়া মুক্তোর টিপ। স্বর্গের পারিজাতকে এনেছি তোমাদের কাছে — তোমাদের কাছে সে রাতজাগা শিউলি হয়ে রামকেলী শুনতে শুনতে তোমাদেরই আঙিনায় ঝরে পড়েছে টুপটাপ টুপটাপ।

রাতে কলাবতীর মিষ্টিমিষ্টি ছোঁওয়ায় চোখ মেলেছে আমার তিনকন্যা - ছাতিম, হিমঝুরি আর গগনশিরীষ। সোহাগী সোনার আলোয় আনন্দে মাথা দুলিয়েছে কাশ-শিবদূতীর জন্যে দিঘিতে নেমেছে কুবলয়ের ঢল — এদের সকলকে আর আদিগন্ত সবুজকে নিয়ে ঋতুরাজের পাটরাণী শরতসুন্দরীর আশ্বিন আমি এসেছিলাম তোমাদের রাজপ্রাসাদ থেকে পর্ণকুটিরে। আমার আকুল আশ্বিনের স্নিগ্ধতায় মাখা শুভ্র জ্যোৎস্নায় দু-দুবার ভাসিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের চারপাশ। আর তাতেই তোমরা অশুভ তকমা দিয়ে সরিয়ে রাখলে আমাকে, নিজের দরজায় আগল দিয়ে নিজের মেয়ে উমাকে আনলে না ঘরে। তাকে বসিয়ে রাখলে ঘরের বাইরে, পাঁজির পাতায় ভর করে অপেক্ষা করলে এই অলক্ষ্মী বিদায়ের।

অথচ অদৃষ্টের কি পরিহাস — তোমাদের করা চরম অপমান আর উদাসীনতা সঙ্গে নিয়ে আমার যাবার শেষ দিনে তোমাদের পাঁজিঘোষিত দেবীপক্ষের সূচনা হল। পুরো পরিবার নিয়ে এক মাস তোমাদের বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত উমা উঠে দাঁড়ালেন - প্রথা-মাফিক

বাৎসরিক পিতৃগৃহে প্রবেশের আশায়। তোমরা তাঁকে আহ্বান করলে "আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষে প্রতিপদ তিথৌ" বলে। তোমাদের কাছে এই অলক্ষী অশুভা তার বিদায়ের দিনে ঐ পাঁজির বিধানে শুভ আর পবিত্র হয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃতির বাঁধা নিয়মে আমি চললাম এবছরের মত — আমার স্থান পূর্ণ করতে এলো ঋতুকন্যা হেমন্ত তার নবযৌবনা রূপ নিয়ে। তার অনেক আশা ছিল কার্তিকের দুষ্টুমিষ্টি আলোয় উমাকে সে বরণ করবে। কিন্তু তাকেও তো তোমরা দিলে না সে অধিকার — নব হেমন্তের কার্তিকে গৌরীবরণের প্রতিটি দিনে যান্ত্রিকভাবে তোমরা বলে চললে, "আশ্বিনমাসে শুক্লপক্ষে অমুক তিথৌ।" হায় রে যুক্তির দৈন্যতায় তোমরা ভেবেও দেখলে না কার্তিকমাসে তোমরা বলে চলেছ "আশ্বিনমাসে..." আর এই দৈন্যতায় বিচিত্র সব বিচার তোমাদের — তোমরা একই কারণে কাউকে অধিক মাসের তকমা দিয়ে সব শুভ কাজ থেকে বঞ্চিত করো, আবার কাউকে করো না।

আশাভঙ্গের বেদনায় ব্যথিত ঋতুকন্যা হেমন্ত তার কার্তিককে নিয়ে কেঁদে পড়েছিল আমার কাছে। ওকে অনেক বুঝিয়েছি আমি। তোমরা যাই করো তবু তো তোমরা আমাদের বড়ো কাছের, বড়ো স্নেহের। তোমাদের ওপর রাগ বা অভিমান কি করা যায়? তোমাদের জ্বেলে দেওয়া আকাশ প্রদীপ দেখিয়ে বলেছি — "ওরা তোর সন্তান - ওদের ওপর

রাগ-অভিমান কি সাজে?” তাই তো গৌরীর ফিরে যাবার পর হেমন্তসুন্দরী হিমেল ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছে চারিদিক। কুয়াশার পাতলা জালে মায়াময় সকাল উপহার দিয়েছে তোমাদের — দিনের উষ্ণ ভালোবাসা আর নরম রাতের কবোষ্ণ বাঁধনে তোমাদের বাঁধবার কি আকুল চেষ্টা করেছে সে। তার কার্তিক তো জানে তিনি আসছেন। সেই তিনি যিনি রূপে ভয়ংকরী আর আদতে শুভঙ্করী। আজ তো সেই দিন — দেখো দেখো আজ কি পরম যত্নে আকাশভরা সাঁঝের প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে দিল সন্ধ্যাতারা।

আকাশ আজ চন্দ্রহীন, মেঘবিহীন চন্দ্রশূণ্য আকাশে আজ তারার আলপনা। ছাতিম, হিমঝুরি, শিউলি আজ সাজিয়েছে তাঁর আসন — লাল জবা তাঁর চরণস্পর্শের প্রতীক্ষায়। কাল তোমরাও জ্বেলেছো চোদ্দো প্রদীপ আর আজ আলোয় আলোয় চারিদিক ভরিয়ে ঘরে আনছো তাঁকে, তিনি আসছেন -তাঁর কালো রূপে জগত আলো -ভৈরবসাথে তাঁর আগমন। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর দিকনির্দেশিত পথে তাঁকে নিয়ে এসো স্বার্থ-সাধ-মান চূর্ণ করে নিজ হৃদয় শ্মশানে - যা তাঁর প্রিয় স্থান। তিনি আসছেন আজ - শিবসাথে আসছেন শিবদূতী - সব অশিব বিনাশ করে পূর্ণতায় ভরে দেবেন। তোমাদের ভরে দেবেন ঋতুকন্যা হেমন্তকে সোনালী ফসলে নবান্ন উৎসব করবে তোমরা - তৈরী হও। ■

বাঘ দেবতার অভিশাপ

ডঃ মালা মুখার্জী

তখন আমার আস্তানা জঙ্গলের ভিতর নদীর ধারের বাংলো। সামনে কুয়াশার চাদরে মোড়া ঘন জঙ্গল। আমি ওভারকোট আর টুপিটা ঠিক করে নিলাম, দিওয়ালি যেতে না যেতেই মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ী অঞ্চলে বেজায় শীত পড়ে যায়।

কানে আসছে দূরে ঝর্ণার জলের আওয়াজ। এই ঝর্ণাটা একটা ছোট নদীতে মিশেছে, আর সেখানে জল খেতে আসে বন্য জন্তুরা। ব্রিটিশ আমলে একটা ওয়াচটাওয়ারও গড়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের 'গেম' বা শিকারের জন্য। তবে পুরোনো ওয়াচটাওয়ারটা বন্ধ, কোনো শিকারী সাহেবের আত্মা নাকি আজও বাঘ শিকারের জন্য আসেন। গ্রামবাসীরা, এমনকি আমার পূর্বতন রেঞ্জারসাহেব অবিনাশ কুমারও গুলির আওয়াজ শুনেছেন কয়েকবার। সকালে শিকারের কোনো নিশানা পাওয়া যায়নি।

এতদিন কারো কোনো ক্ষতি হয়নি, তবে কয়েক মাস যাবৎ সত্যি সত্যি বাঘ আসছে জঙ্গলে। বাঘ লোকালয়ে এলে ঘুমপাড়ানি গুলি করাই দস্তুর ফরেষ্ট রেঞ্জারদের। কিন্তু, অবিনাশজী একটি বাঘকে গুলি করেছিলেন, ঘুমপাড়ানি গুলি নয়, সত্যি গুলি। বাঘটার মৃতদেহ পরদিন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

ভয়

গ্রামের মোড়ল বলেছিল রেঞ্জার সাহেব মা বাঘিনীকে মেরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাঘ-দেওতার অভিশাপকে। কাউকে ছাড়বে না সেই শাপ, বাঘিনী ফিরে আসবে। বুড়ো মোড়ল একটা অদ্ভূত মূর্তি দেখায় আমায়, আধা মানব, আধা বাঘ, ইনিই বাঘদেওতা, জঙ্গলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমি মূর্তিটাকে প্রণাম করতে, বুড়ো খুশী হয়ে একটা তাবিজ দিল, জঙ্গলের শ্বাপদ থেকে আমায় এটি রক্ষা করবে। অবিনাশজী নাকি তাবিজ ধারণে অসম্মত হন।

আমি একটু অস্বস্তি পেয়েছিলাম কথাটা শুনে, অবিনাশজী আত্মহত্যা করেন, সম্ভবত বাঘ মেরে চাকরি খোয়াতে বসেছিলেন, এখনও তাঁর পরিবার এই অপরাধের মাশুল গুনছে। আমি তাবিজটা নিলাম, নিজের বিশ্বাসে নয়, স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে। আমি নতুনই চাকরিতে জয়েন করেছি, তাই হয়তো অবিনাশজীর মতো ডাকাবুকো হতে পারিনি এখনও।

আদিবাসীদের গ্রাম থেকে ফেরার পথে কূনওয়ার আমার তাবিজটা দেখে হাসল, “আপ ভি সোচতে হো কি যো শের গাঁওকে আশপাশ ঘুম রহা হ্যায়, ও শের নেহি, আত্মা হ্যায়?”

তবে কি বুড়োর কথাই ঠিক? নদীর ধারে যে বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে, আর যে বাঘটি গ্রামে হামলা চালাচ্ছে তা আসলে এক অভিশপ্ত ব্যাঘ্রমানুষের কীর্তি? কিন্তু অবিনাশজী তো মারা গেছেন? তবে এই ব্যাঘ্রমমানুষ কি

তিনিই? সকালের কথাগুলো ভাবছিলাম।

রাত গাঢ় হচ্ছে, ল্যাপটপের স্ক্রিণে চোখ রাখলাম, নাইটভিশন সিসিটিভি ক্যামেরায় কোনো জন্তুরই উপস্থিতি চোখে পড়ছে না, অথচ নদীতে পশুর জলপানের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। নিশ্চয় গাঢ় কুয়াশাই এর জন্য দায়ী। আমি বন্দুকটা লোড করলাম, অভিশাপে বিশ্বাস করি না।

এই বাংলো থেকে নদী বেশীদূর নয়, তবু কূনওয়ার সিংকে ডাকতে গেলাম। কোনো সাড়া শব্দ পেলাম না কূনওয়ারের, বোধকরি কূনওয়ার ঘুমোচ্ছে। যদিও রেঞ্জার সাহেব ডাকলেই ওর হাজির হওয়াটাই ডিউটি, তবুও কূনওয়ার এলো না। আমি ড্রাইভার কোয়ার্টারসের দিকে এগোলাম। দু'পা গিয়েই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম, ওর ঘরের দরজা খোলা, ভিতরে কেউ নেই। ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালালাম, ছিন্নভিন্ন শার্ট, ট্রাউজার। ঘরের জিনিস সব লণ্ডভণ্ড। কূনওয়ারের ঘরে ডাকাত ঢুকলো নাকি? অস্বাভাবিক নয়, সরকারি বাংলোগুলোকে মাঝে মধ্যেই সমাজবিরোধীরা টার্গেট করে, তবে সেক্ষেত্রে আমার বাংলোকেই টার্গেট করা উচিত ছিল। ঘরের বাইরের মাটিতে জানোয়ারের পায়ের ছাপ। নরখাদক বাঘ এদিকে এসেছিল? কিন্তু, কূনওয়ার তো অসহায় শিশু নয়, জঙ্গলেরই ছেলে, বন্দুকের লাইসেন্সও আছে। অনেকবার বলেছে, ওদের গ্রামে বাঘ ঢুকলে ও মেরেছে, ওর বন্দুকের টিপ খুব ভালো ।

ভয়

না, না, এসব কি ভাবছি? কূনওয়ার বোধহয় একাই হিংস্র শ্বাপদের পিছু নিয়েছে। আমিও সতর্ক হলাম। গাড়ীর আওয়াজে বাঘ পালাতে পারে, তাই নদীর পাড় ধরে সাবধানে একাই হেঁটে চললাম। বাংলোর একটু দূরেই নদী, আর পরিত্যক্ত ওয়াচটাওয়ারটি। কিছু একটা নড়ছে। আমি কাছে যেতেই বুঝলাম বাঘ নয়, মানুষ। তার পরণে এ শীতেও কিছু নেই। লোকটি আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালো। মোবাইলের ফ্লাশ লাইটে দেখলাম তার লাল ক্রুর চোখ, পাশবিক চাহনি, শরীরের চামড়ায় হলদে কালোর ছোপ। ভুলে গেলাম বন্দুক তুলতে, মুখ দিয়ে অস্ফূটে বেরিয়ে এলো একটাই শব্দ, "কুনওয়ার সিং!"

কুনওয়ার সিং হাঁ করলো, মুখের ভিতর শ্বাদন্ত ঝকঝক করছে। ওর হাতগুলি বাঘের থাবায় পরিণত হচ্ছে। বুক আর কাঁধের পেশী শক্ত হচ্ছে। চোখের মণি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

কুনওয়ার ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, "বাঘের চামড়ার লোভে গুলি চালিয়ে মেরেছিলাম বাঘিনীটাকে, সাহেব দেখেছিল, তাই তাকেও মেরেছি। আজ তোর পালা..." কুনওয়ার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক মুহুর্তের জন্য মনে হয়েছিল সব শেষ। কিন্তু তখনই আর একটা কিছুও যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের মাঝখানে। আমার হাত থেকে মোবাইলটা পড়ে গেল, তবুও দেখতে পেলাম আরও একটি পূর্ণ বয়স্ক বাঘ। কূনওয়ার সিংয়ের বাঘরূপ সম্পূর্ণ হয়নি

ভয়

তখনও, অর্ধ মানব, অর্ধবাঘ, লড়াই করে চলেছে একটি পূর্ণ বয়স্ক বাঘের বিরুদ্ধে। অদূরে দামামা বাজছে, জ্বলছে মশাল বুঝলাম গ্রামবাসীরা আসছে, সঙ্গে বনকর্মীরাও। ওরা কাছে আসার আগেই ওপাশের ঘন জঙ্গলে লাফ মারলো বাঘটি, আবছা আলোয় বুঝলাম এটি একটি বাঘিনী।

"স্যার, আপনি ঠিক আছেন তো?" বনকর্মীদের ডাকে হুঁশ ফিরল। "আমরা জঙ্গলের ক্যামেরায় কুনওয়ার সিংকে বাঘের মুখে পড়তে দেখি, ও একা একা কি করছিল জঙ্গলে?" আমি বুঝলাম না, নাইটভিশন ক্যামেরা কেন আমায় কূনওয়ারকে দেখালো না!

গ্রামের মোড়ল মাথা নাড়লো, "লালচ, বাবুজি, লালচ! কূনওয়ার গাঁও কাই লেড়কা থা, লেকিন নোকরি মিলতেই গলত কাম করনে লাগা। শের কো লালচ দিখাকর গাঁও মে লাতা থা, রেঞ্জার সাহাব নিদ কি গোলি লে কর আয়ে থে, উসনে ভি গোলি মারা থা ওয়াচটাওয়ার সে, সাহাব কা গোলি শেরকো নেহি লাগা, আসলি গোলি লাগা। এ দেখিয়ে!" বুড়ো মোড়ল একটা বিদেশী বন্দুক বার করে দেখালো, "পুরানা ওয়াচটাওয়ার মেঁ কোই নেহি যাতা, ভূতো কি কাহানিয়া কূনওয়ার জানবুঝকর বোলা থা.." ভুতুড়ে শিকারির বন্দুকের গুলি বলে চালাতো! সত্যি, কূনওয়ারের হাতের টিপ অব্যর্থ!

"এসব আগে বলেননি কেন?" আমি বুড়োটিকে রাগত

স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, "গ্রামের ছেলে পোচিংয়ে যুক্ত তাই?"

"গলতি হো গয়া, বাবুজী। আগর অ্যায়সা চিজ ওয়াচটাওয়ার মেঁ মিলেগা তো পুলিশ হামলোগকো বহুত পড়েশন করেগা।" বুড়োর কাঁচুমাচু মুখ দেখে মায়া হলো, লোকটির কথায় যুক্তি আছে, আর গাঁয়ে নিশ্চয় কূনওয়ারের প্রতিপত্তিও ছিল। আমি বুড়োর সাথে বাগবিতণ্ডা বন্ধ করে কূনওয়ারের মৃতদেহের দিকে তাকালাম। কূনওয়ার সিংয়ের দেহে বাঘরূপ আর অবশিষ্ট নেই, পড়ে আছে তার ছিন্নভিন্ন দেহ, মৃত বাঘিনী প্রতিশোধ নিয়েছে। বাঘদেবতার অভিশাপ আজ চিরতরে ছেড়ে গেছে ওর দেহকে।

"দেওতা কিসি কো নহি ছোড়তা, বাবুজি, উনহনেই আপ কা জান বঁচায়া..." বুড়ো মোড়ল বাঘ দেওতাকে প্রণাম করলো।

আমি ফরেষ্ট অফিসারদের বললাম, "আমি ঠিক আছি, তবে রেঞ্জার অবিনাশ কুমার যে নির্দোষ ছিলেন তার প্রমাণ পেয়েছি। আমায় শিগগিরি উপরওলার সাথে কথা বলতে হবে।"

প্রকৃতির প্রতিশোধ শেষ হয়েছে, দেখি যদি অবিনাশবাবুর পরিবারটিকে বাঁচাতে পারি আইনি জটিলতার হাত থেকে। তবে তারও আগে একটা কাজ করতে হবে, আদিবাসী গ্রামে গিয়ে বাঘদেবতার পুজো দিতে হবে, আজ তাঁর জন্যই আমার জীবন রক্ষা পেল। আমি ভক্তিভরে গলার তাবিজটি স্পর্শ করতে গিয়ে বুঝলাম সেটি অদৃশ্য হয়েছে। ■

বাজি কাহিনী

অমিত নাগ (আমেরিকা)

মানাদা বললো, “আজ তুবড়ি বানাবো দুপুরবেলায়, পারলে আসিস।” সদ্য দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে। বলাকা, আগমনী, কিংবা কিশোর ভারতীর শারদীয়া সংখ্যায় কোথায় যেন অ্যালকেমিস্টদের গল্প পড়েছি। তারা পারা থেকে সোনা বানাতে পারতো এটা সেটা মিশিয়ে। মানাদাকে আমার কেমন অ্যালকেমিস্ট অ্যালকেমিস্ট মনে হয় কালীপুজোর আগে এই তুবড়ি বানানোর সময়।

হাসিখুশি মানাদা, তুবড়ির মশলা বানানোর সময় কেমন গম্ভীর একাগ্রচিত্ত। দাদা কাকার থেকে পাওয়া সিক্রেট ফর্মুলা। সবাইকে এককথায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, ধার করে সেজদার চায়ের দোকান থেকে অন্যদের চা ঘুগনি খাওয়ানো উদার হৃদয় মানাদার মনের দুর্বলতম কোণ, এই তুবড়ির মশলার ভাগের রেসিপি জমিয়ে রাখা জায়গাটা। প্রাণ গেলেও, পারতপক্ষেও বুকের ভেতরে আড়াল করে রাখা এই সম্পত্তির হাত পরিবর্তন হতে দেয় না মানাদা।

সোরা, গন্ধক, কাঠকয়লা। ৬:২:২ অথবা ১২:৪:৩, জামার আস্তিনে লুকিয়ে রাখা ট্রাম্প কার্ডের মতো এক একজনের এক এক রকম ফর্মুলা। জানতো না কেউ, তাই জানিনা আজও। এর সঙ্গে এক একজনের এক এক রকম যোগ —

নস্টালজিয়া

অ্যালুমিনিয়াম পাউডার, ম্যাগনেসিয়াম বা লোহাচুর, চুনের গুঁড়ো, বিশেষ বিশেষ রঙের বাহারের জন্যে। কেউ বলে কাঠকয়লাটাই তুবড়ির মতো উড়ন্ত বাজির আসল জান। কাঠকয়লা হবে হালকা ফুলকা কিন্তু জ্বলবে দাবানলের মতো। অর্থাৎ সেই ওজন আর শক্তির অনুপাত। কম ওজন হতে হবে কিন্তু এনার্জি আউটপুট হবে বেশি। ইসরোর রকেট বানানোর চ্যালেঞ্জও ওই একই। ছোট্ট একরত্তি স্যাটেলাইট আকাশে তুলতে বিশ ত্রিশ তোলা উঁচু রকেটটার পুরোটাই প্রায় জ্বালানী ভরা। যদি কম জ্বালানী ভরে স্যাটেলাইট তোলা যেত, তবে বেশ হতো। আমাদের রন্টু এসব ব্যাপারে একটু বেশি খোঁজ রাখে দাদাদের পাশে পাশে ঘুরে, ফাই ফরমাশ খেটে। একদিন কানের কাছে ফিসফিস করে গূঢ় ত্বত্তের মতো পেশ করে, ও নাকি জানতে পেরেছে বেগুন গাছের আর সজনে গাছের ডাল পালা পুড়িয়ে তৈরী কাঠকয়লাই বেস্ট।

মানাদা কাঁচামাল সব কিনে এনে দুপুর বেলায় বাগানে মাটি খুঁড়ে উনুন বানিয়ে সোরা গন্ধক ভেজে শুকোয়। তারপর হামান দিস্তা দিয়ে গুঁড়িয়ে শুকনো কাপড়ে ছাঁকে। পাড়ার দশকর্মা ভান্ডার পুজোর এই বিশেষ সময়ে এসব মাল মশলা এনে স্টকে রাখে। অতটা খোলাখুলি নয়, খানিকটা গোপনে, সিনেমা হলের পাশের গলিতে ব্ল্যাকারের থেকে সিনেমার টিকিট কেনার মতো একটু ফিসফিস করে কিনতে হয় সে সব মশলা।

নস্টালজিয়া

পাড়ার ক্লাবে তুবড়ি প্রতিযোগিতা হবে। মানাদা এক মনে মশলা বানায়। দইয়ের হাঁড়ির মতো দেখতে অথচ খুদে খুদে মজাদার মাটির হাঁড়িতে ঠেসে ঠেসে মশলা ভরে মাটি দিয়ে সীল করে তুবড়ি বানায়, বসানো তুবড়ি প্রতিযোগিতার জন্যে। প্রেস্টিজের ব্যাপার বলে কথা। আর বানায় ছোট ছোট বেশ কিছু উড়োন তুবড়ি কালীপুজোর রাতে জ্বালানোর জন্যে। সারাদিন সঙ্গে থেকে, আমি হয়তো দু'একটা উড়োন তুবড়ি ফাউ হিসেবে পুরস্কার পাবো। আশায় আশায় চুপচাপ মানাদার কাজকর্ম দেখে যাই। তুবড়িগুলো এবার থেকে ক'দিন রোদ খাওয়ানো হবে লাগাতার।

পাড়ার ক্লাব ঘরের লাগোয়া ছোট মাঠে তুবড়ি প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছে। লম্বা উঁচু একটা বাঁশে নির্দিষ্ট উচ্চতার ফাঁকে ফাঁকে কাগজে লেখা ২৫, ৩০, ...৫৫, ৬০, ৬৫ ফুট। একাধিক বিচারক নোটবুক হাতে প্রস্তুত। একটা করে প্রতিযোগীর নাম, তুবড়ির নাম বলা হলে, জ্বালানো হবে। বিচারকরা লিখে নেবে কতটা উঁচুতে উঠলো আলোর ফুলকি।

যারা একটু চিন্তা করে নাম রেখেছে তারা তুবড়ির নাম দিয়েছে সোনাঝুরি, আলোকতরী, চাঁদের আলো, এই সব। কেউ কেউ অতো চিন্তা ভাবনার তোয়াক্কা না করে চালু জনপ্রিয় সিনেমার নামে আস্থা রেখে নাম দিয়েছে দীপ জ্বেলে যাই, অগ্নিপরীক্ষা, রাতের রজনীগন্ধা।

একটু রাতের দিকে শুরু হবে প্রতিযোগিতা। ততক্ষনে

নস্টালজিয়া

আমাদের নিজেদের সামান্য সংগ্রহের বাজি জ্বালানো হয়ে যাবে। কয়েকদিন ধরে ছাদে খবরের কাগজ পেতে নিয়ম করে শুকোনো হয়েছে নিজের নিজের ভাগের পাওনা কালীপুজোর বাজি - দোদোমা, চিনেপটকা বা লংকাপটকা, ফুলঝুরি, রংমশাল, ইলেকট্রিক তার, সাপবাজি। সাপবাজির দাগ থেকে যায় উঠোনে, ছাদে পুজো শেষ হয়ে যাবার পরেও কত কত দিন অবধি। সাইরেনটা অদ্ভুত — ছোট টিনের কৌটোয় মশলা বারুদ ভরা। একটা ফুটো কৌটোর এক ধারে। আগুন দিলেই পাগলের মতো ঘুরতে ঘুরতে আওয়াজ করে ওপরে উঠে যায়। খানিকটা যেন ছুঁচোবাজির মতো আনপ্রেডিক্টেবল। হাত থেকে ছাড়া পেলে কার গায়ে গিয়ে যে সেঁধোবে বলা ভারী মুশকিল। সব বাজি পোড়ানো শেষ হয়ে গেলে, শেষ পড়ে থাকা কতকগুলো রং দেশলাই জ্বালিয়ে উৎসবের রেশটুকু ধরে রাখার চেষ্টা করে যাবো আমরা কজন ভাইবোন।

বিদেশের বেশিরভাগ দেশে এসে থেকে দেখছি, ব্যক্তিগত উদ্যোগে যথেচ্ছ বেপরোয়া বাজি পোড়ানো প্রায় হয় না বললেই চলে এসব দেশে। হয় না শুধু নয়, আইন করে হতে দেওয়া হয় না, অগ্নিকান্ড এবং দূষণের ঝুঁকি এড়াতে। ভারতবর্ষের মতো দেশেও আইন করে, সবার কথা ভেবে বাজি পোড়ানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত। মানুষ দায়িত্বশীল না হলে আদালতকে বছর বছর ধরে রায় দিয়ে বলে দিতে হবে

কেন, কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক! অতএব চাই কড়া আইন।

নিউইয়ার, বা দেশের স্বাধীনতা দিবসের মতো বিশেষ বিশেষ দিনে বিদেশি শহরগুলোর পৌরসভার মতো সরকারি সংস্থার উদ্যোগে পার্ক, নদীর ধারে খোলা জায়গায় বাজি পোড়ানো হয়। দেখার মতো সেসব ফায়ার ওয়ার্কস। আকাশে হাউই উঠে সশব্দে ফেটে পড়ার পর রঙের ফুলকি ছিটিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পরে আতস বাজিরা। আকাশ দিনের মতো আলোময়, শব্দময় আর বর্ণোজ্জ্বল হয়ে ওঠে ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট ধরে। বিলিতি বাজির কারিগরদের নাম ডাক খুব সারা পৃথিবী জুড়ে। সিডনির হারবার ব্রীজের ওপর, হংকংয়ের সীফ্রন্টে, নিউইয়ারের সময় পোড়ানো বাজি অথবা সিঙ্গাপুর, আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে পোড়ানো বাজি হোক, কোনো না কোনো ভাবে ব্রিটিশ পাইরো টেকনিশিয়ানদের হাতের ছোঁয়া থাকবেই তাতে। হয় বিলেত থেকে সরাসরি কেনা বাজি অথবা বংশ পরম্পরায় বসবাসকারী বিলিতি অভিবাসীদের নিজস্ব ঘরানার ছোঁয়ায় তৈরী সে সব আতস বাজি।

সিডনির হারবার ব্রীজ, সিঙ্গাপুরের পার্লামেন্ট বাড়ির সামনে বা আমেরিকার কোনো শহরের আলো ঝলমল আতসবাজির রোশনাই দেখতে দেখতে বহুদিন আগের দেখা তুবড়ি প্রতিযোগিতার কথা মনে পড়ে যায়। ছাদের ওপর নিজেদের সংগ্রহ সামান্য বাজি পোড়ানো, মানাদার দেওয়া উড়োন তুবড়ি

ওর শেখানো কায়দায় আড়াইবার চক্কর কেটে আলতো করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েও ওর মতো বহু উঁচু আকাশ অবধি উড়ে যেতে না দেখতে পারার ব্যর্থতার কথা মনে পড়ে।

আরো মনে পড়ে, পাড়ার প্রান্তে কোনো এক প্রতিবেশীর বাড়ির দরজার চৌকাঠে, উঠোনে আর পাঁচিলের ওপর দেওয়া সারি সারি প্রদীপ অথবা মোমবাতির আলো। হাওয়ায় দুলে ওঠা শিখাগুলির আলোয় সারা বছর ধরে দেখে আসা আড়ম্বরহীন সাধারণ বাড়িটাও অসামান্য আর মায়াময় লাগে সেই সন্ধ্যায়। দরজা পেরিয়ে ঢুকতে ঢুকতে দেখি, অন্যদিনের রাগী রাগী চেহারার পাড়ার কোনো ছেলেকে পাত্তা না দেওয়া সুশ্রী দিদিটি আজ কেমন হাসতে হাসতে একটু যেন বেশি প্রগলভ হয়েই, আমাদের বয়েসী তার বোনটির সঙ্গে ফুলঝুরি জ্বালাচ্ছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আমার দিকেও আজ তার প্রশ্রয়ের স্নেহ ভরা দুচোখের দৃষ্টি এসে পড়লো বলে মনে হয় যেন। কাকীমা কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে এসে জিজ্ঞাসা করেন, “এতদিনে বুঝি আমাদের কথা মনে পড়লো।” হেসে বলি, “পুজোর ব্যস্ততায় ছুটি শেষ হয়ে এলো। আজ কালীপুজো। আর তো ভাইফোঁটার পরেই স্কুল খুলে যাচ্ছে। তাই ভাবলাম বিজয়ার প্রণামটা সেরেই যাই আজ। জানেন তো কাল ক্লাবের মাঠে পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা দেখানো হবে।” কাকীমা ‘থাক থাক’ বলতে বলতে আমাদের বয়সী তার লাজুক ছোট মেয়েটির

দিকে তাকিয়ে বলেন, "কি রে, ওকে একটু বসতে বল। আমি যাই রান্নাঘর থেকে কিছু নিয়ে আসি।" কিশোরীর মুখে ফুলঝুরির কম্পমান আলো। নাকের ওপরে জমা বিন্দু বিন্দু ঘাম জ্বলন্ত হিরে কুচির মতো। সেই আলোয় দেখলাম, একটু বুঝি রাঙাই দেখালো মুখখানি। কপট রাগ দেখিয়ে সে বলে, "আমি তো এখন দিদির সঙ্গে বাজি পোড়াচ্ছি।"
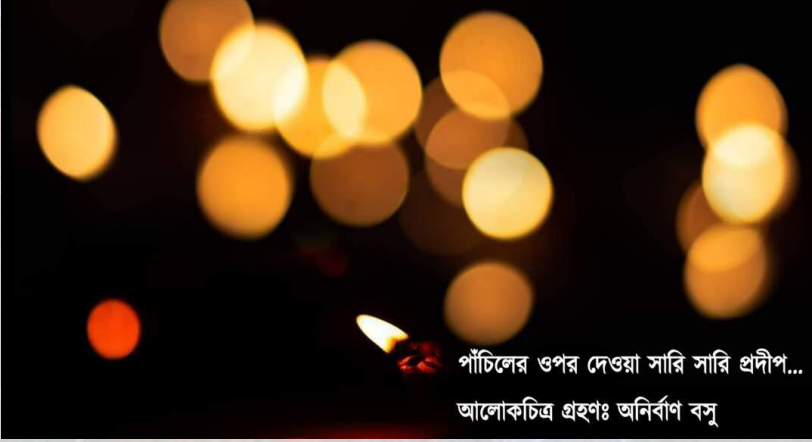
পাঁচিলের ওপর দেওয়া সারি সারি প্রদীপ...
আলোকচিত্র গ্রহণঃ অনির্বাণ বসু

আমাদের এই অত্যাধুনিক শহরের আকাশে বিলিতি মাস্টার পাইরোটেকনিশিয়ানের তৈরী আতসবাজির রোশনাই দেখতে দেখতে, আশেপাশের মানুষদের হাসি আর গল্প শুনতে শুনতে, অনেক দশক আগের একটা আপাত অন্ধকার সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের উঠোনের ছবি মনে ভেসে ওঠে পলিচাপা অতীতের গভীর তলদেশ থেকে। সেখানে মাটির প্রদীপ আর মোমের কম্পমান আলোয় স্বল্প লাজে অল্প রাঙা এক কিশোরীর মুখচ্ছবি ফুটে ওঠে কতদিন পরে, হঠাৎই। আপাতভাবে বিনা কোনো কারণ ছাড়াই। ■

মা ও মেয়ে

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

ভূতের পরলোক যাত্রা

অসিত চট্টোপাধ্যায়

আমার ওপর আমার বৌয়ের ভরসা কম। আমি নাকি সব গোলমাল করে ফেলি। আমার ভীমরতি হয়েছে। যেখানেই যে কাজে যাই না কেন বৌ সঙ্গে। সাইবার কাফেতে টিংকুর কাছে গেছি অনলাইন টিকিট কাটতে। বেনারাস যাব। টিংকু আমার কথা কানেই নেয় না। বলছি "বিভূতি এক্সপ্রেসে এসি থ্রিতে দুটো লোয়ার বার্থ কবে খালি আছে দেখো।" সে অন্যের কাজে ব্যস্ত। আমি যে সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখছেই না। ভাগ্যিস বৌ সঙ্গে ছিল। সে বললে "কাকে কি বলছ? ও কি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে না তোমাকে দেখতে পাচ্ছে? যদি দেখতে পেত তাহলে টিংকু নিজে আর দোকানের সকলে ভয়ে দৌড় দিত। দোকান ফাঁকা হয়ে যেত।"

"কেন দেখতে পাচ্ছে না কেন?"

"আমরা দুজনেই তো অতিমারি করোনাতে নিহত হয়ে আর ইহলোকে নেই। করোনা পজিটিভ হ'লেও মৃত্যুর কারণ কোমরবিটি। তোমার হাই সুগার, প্রেসার, থাইরয়েড আর তার সঙ্গে ছিল অ্যাসমা। শ্বাসকষ্ট ইনহেলারে কমছে না দেখে হাসপাতালে দেওয়া হল। টেস্টে ধরা পড়ল করোনা পজিটিভ। কদিন যেতে না যেতেই তুমি নো বডি। তোমার

বডি পৌর কর্তৃপক্ষ ধাপায় জ্বালিয়ে দিল। শেষ সময় জল কি শ্মশান পর্যন্ত পেলে না।”

“আর তুমি?”

“আমারও তাই হল। সামান্য জ্বর হয়েছিল। বেশ কিছুদিন হোম কোয়ারিন্টিনে থেকে প্যারাসিটামল, গরম জলে গার্গল এসব করলে হয়তো করোনা মুক্ত হয়ে যেতুম। ছেলে-বৌ রিস্ক নিলে না। বললে বাড়িতে তোমার চার বছরের নাতি আছে। তার কথা ভেবে তোমার বাড়িতে থাকা ঠিক নয়। আমিও প্রেসার, কোলেস্টোরেলের ওষুধ খাই। দিয়ে এল কোভিড হাসপাতালে। ব্যাস এক গতি তোমার মত।”

“তাহলে কি হবে! টিকিট না কেটে বেনারাস যাব কি করে?”

“এই জন্যে বলি তোমার ভীমরতি হয়েছে। আমাদের আর টিকিট লাগবে না। আমরা অশরীরী। সূক্ষ্ম দেহে যেখানে খুশি যেতে পারি। যেখানে খুশি থাকতে পারি।”

“সে কি হয় নাকি, আমি বিনা টিকিটে যাব! আমি একজন সরকারি অফিসার। পাড়ার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। গ্রুপ থিয়েটার করা আর্টিস্ট। বড় বড় জায়গায় অভিনয় করেছি। আমি বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠব?”

“অ্যায় শুরু হ'ল ‘আমি আমি’। তুমি আর কিচ্ছু নও। পাস্ট টেনস। ভূতপূর্ব। তুমি ছিলে এখন নেই।”

“আর তুমি?”

“আমিও তাই। আমাদের আর টিকিট ফিকিট নিয়ে

ভাবার দরকার নেই। ইচ্ছে যখন হয়েছে চল যাই বাবা বিশ্বনাথ দর্শনে।”

মনে মনে ভাবি কি অভূতপূর্ব ব্যাপার! আমি ভূতপূর্ব! দাদাগিরিতে একটি মেয়ে এসেছিল, সে এইসব অশরীরী, যাকে লোকে ভূত প্রেত ব্রম্ভদত্যি বলে এসব নিয়ে গবেষণা করে। নানা যন্ত্রপাতি যা তার গবেষণায় ব্যবহার করে সে সব দেখাল। সে বলছিল আমরা বুঝতে পারিনা হয়তো আমার পাশেই এক অশরীরী শক্তি রয়েছে। এখন আমি নিজে তাই। আনন্দে হাততালি দিই। হো হো করে হাসি। হাসি থেমে যায় যখন বিক্রম তেওয়ারির কথা মনে পড়ে। সেও তাই করত অশরীরী আত্মা, ভূত প্রেত এসব নিয়ে গবেষণা করত। কত ভূতুড়ে বাড়িতে গেছে গবেষণার কাজে। সে বলত সব সূক্ষ্ম আত্মা ক্ষতি করে না। মেরেও ফেলে না। বরং কল্যাণ করে। কতজনকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করে। কিছু দুষ্ট আত্মা আছে যারা বিব্রত করে। দিল্লীতে বিক্রমের নিজের মৃত্যুই রহস্যজনক।

যাই হোক আমরা বেনারস চলে এলুম। সবসময় এসে উঠি ভেঙ্কটেশ্বর লজে। এবারও উঠলুম। এই লজের মালিক কাম ম্যানেজার মোহন আমার খুব চেনা। কিন্তু এবার আমাকে চিনবে কি, দেখতেই পাচ্ছেনা। যে ঘরে বহুবার থেকেছি সেই দোতলার পাঁচ নম্বর রুমে উঠলুম। ঘরটা খালি। কোন বোর্ডার নেই। জানলা দিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে

যাবার রাস্তা, বৃহস্পতি মন্দির দেখা যায়। বাবা বিশ্বনাথ দর্শন করলুম। খুব ভীড়। কিন্তু আমরা অশরীরী। অবলীলায় বাবাকে দর্শন করলুম। বাবার মাথায় জল ঢাললুম। সেবাইত একজন ভক্তকে প্রায় খেঁকিয়ে উঠল। "আরে আপনার ঘটি থেকে দুধ গঙ্গাজল পড়ে যাচ্ছে যে। সে বললে কই! আমারটা তো পুরো ভর্তি আছে। আর আমি তো বাবার মাথার ওপর ঘটিটা ধরেও নেই। হাতটা যাচ্ছে না। ভিড়ে কে যেন ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।" তারা তো আর বুঝছে না আমি তার হাত ঠেলে সরিয়ে বাবার মাথায় জল ঢেলেছি।

ভাবলুম যাই দশাশ্বমেধ ঘাটে। প্রতিবারের মত নৌকা করে সেই অসি ঘাট, তুলসি ঘাট, কেদার ঘাট দেখে মণিকর্নিকা ঘাট হয়ে পঞ্চগঙ্গায় ত্রৈলোক্যস্বামীর সমাধি দর্শন করে আসি। কিন্তু কি কান্ড কোন মাঝি কথাই কয় না। আমার বৌ আবার বললে। "কোন দরকার নেই। আমরা যে কোন নৌকায় চড়ে চলে যেতে পারি।" আমি বললুম, "তাই চল। যে কোন নৌকায় চড়ে বসি। ইচ্ছেমত কোন ঘাটে নামব আবার উঠব।" মনে মনে ইহলোকের অভ্যাসমত 'ভব সাগর তারন কারন হে' গানটা গাইছি। ওমা একজন মাঝি এগিয়ে এল। বলল "ভব সাগরের পারে যাবে?" আমি বললুম, "এসে তো গেছি আবার কোথায় যাব?"

"না ভব সাগরের পারে যাওনি। এখানেই আছ। দেখছনা অশরীরী হয়ে এই হিংসা-বিদ্বেষ ঘৃণার পৃথিবী থেকে, মায়ার

জগত থেকে নিস্তার পাওনি।”

“এখন আর কি করব এসে যখন পড়েছি। বাবার কাছে বলি যদি বাবা কিছু করেন! যাকগে তুমি নিয়ে যাবে আমাদের বেনারসের ঘাট দেখাতে?”

“এস আমার নৌকায়...”

“ভাড়া কত নেবে বল?”

“দিতে পারবে ভাড়া!”

“কেন পারব না, জান আমি সরকারি অফিসার ছিলুম? থিয়েটার করেছি কত বাঘা বাঘা আর্টিস্টদের সঙ্গে। পাড়ার ক্লাবের আমি প্রেসিডেন্ট।”

“এই ‘আমি আমি’ করার জন্যে ভব সাগরের পারে যেতে পারনি। যাকগে তুমি লোক তত খারাপ নও। তোমাকে আমি সব ঘাট ঘুরিয়ে শুদ্ধ করে পার করে দেব। এসো তোমরা আমার নৌকায়।” তার নৌকায় আমরা কর্তা গিন্নী চড়ে বসলুম। সব ঘাট দেখছি। আরো নৌকায় কত তীর্থযাত্রী নৌকা বিহার করছে। আমি দেখতে পাচ্ছি। তারা কেউ আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। দেখলুম কালু ডোমের বাঘওয়ালা বাড়ি। তাদের বংশধরেরা আজও আছে। হরিশচন্দ্র ঘাটে তাদের প্রচুর আয়। ধনপূর্ণ তারা। হরিশচন্দ্র ঘাটের আশপাশের বাড়ি থেকে হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ বিশ্রী উৎকট ভূতের হাসি শুনতে পেলুম। যেমন বহু ভূতের গল্পে পড়েছি, টিভি নাটক সিনেমায় দেখেছি। আমরা, এই মাঝিও তো

অশরীরী। এমন বিশ্রী বিকট পিলে চমকানো হাসি তো কেউ হাসি না। এরা কারা? মৃত্যুর আগে এরা কি ছিল কে জানে! এইসব ভাবছি। ভাবছি গবেষক বিক্রম তেওয়ারী হ'লে বলতে পারত। ও-মা, ঠিক পাশ থেকে শুনতে পেলুম "শুনবেন কারা এরা? মৃত্যুর আগে এদের পরিচয় কি ছিল?" চমকে তার দিকে চেয়ে দেখতেই বললে "চিনতে পারল্েন না তো আমাকে? আমি কে তাই তো?"

"হ্যাঁ, কে আপনি? এই নৌকায় যখন উঠেছেন দেখতে পাইনি। আপনাকে চিনলাম না তো!"

"আমি বিক্রম তেওয়ারী। আপনি আমায় ক্লিক করলেন মানে স্মরণ করলেন তাই চলে এলুম। মৃত্যুর পরে আমি প্রেতলোকে এসেও এই সব সূক্ষ্ম আত্মাদের নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি।"

"সিনেমা থিয়েটারে যে সব ভূতের বিকট হাসি শুনি সেরকম উৎকট হাসি আমি আপনি হাসছি না। ওরা হাসছে। ওরা কারা?"

"সদাশয় আত্মা সভ্য ভদ্র। তাদের হাসি স্বাভাবিক। আর ওরা সব গত লোকের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী আর তাদের চেলা চামুন্ডার দল। এরা প্রেতলোকের দখল নিতে চায়। ক্ষমতা চায়। কালু ডোমের বাড়ি ওদের বিধানসভা। হাতাহাতি মারামারি, কটুকথা লেগেই আছে। পুরোনো অভ্যেস। ওদের বিকট হাসিতেই মানুষ ভয় পায়।" নৌকা

ভূত-পর্ব

মণিকর্নিকা ঘাটে এসে লাগল। কত চিতা জ্বলছে। বৈদ্যুতিক চুল্লীও আছে। মাঝি আমাকে বললে নেমে যান। আমার বৌও নামতে যাচ্ছিল। ওকে মাঝি বলল "আপনি বসুন। উনি বড্ড 'আমি আমি' করছেন। কাঁচা আমি থাকলে ভবসাগরের পারে যাওয়া যায় না। আমিটা বিসর্জন দিয়ে শুদ্ধ হয়ে আসুন। তখন পৌঁছে দেব।"

নেমে পড়তে হল। মাঝিকে চেনা চেনা লাগে। মনে করতে পারিনা কে উনি। যে অফিসে ডেড বডি এনে ডাক্তারের ডেথ সার্টিফিকেট দেখিয়ে দাহ করার অফিসিয়াল কাজকর্ম হচ্ছে সেখানে গেলুম। তারা আমার কথা শোনেই না। একজন আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল "আমায় চিনতে পারছ?"

"আরে দিবা দা! তুমি তো..." থেমে যাই বলতে পারিনা কথাটা।

"হ্যাঁ আমার ফাঁসি হয়ে এখানে এসেছি। এখানেও 'সেম ডিউটি' করছি।"

মনে মনে ভাবি 'সেম ডিউটি' আবার কি। দিবাদার ভাল নাম দিবাকর মালিক। আমাদের পাড়ায় বাড়ি। রাজনীতি করত। অ্যাকশন স্কোয়াডে ছিল। বার বার দল পাল্টাত। আসলে সুপারি কিলার ছিল। দলের নির্দেশে কাজ হাসিল করত। ডাক্তারদের মত প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করত। কেউ প্রেমঘটিত, সম্পত্তির দখলদারি এসব নিয়ে রফায় এলে মাল খালাস করে দিত। দিবাদাই বলল, "তুই কবে কি করে

মরলি? কলকাতা ছেড়ে এখানে কেন? কোলকাতায় গাছ পালা নেই বটে, কিন্তু ফ্ল্যাট তো বহু। কোথাও বেছে নিয়ে থেকে যেতিস। আমাদের মত ক্রিমিনাল, বদমাসগুলো ঐসব ফ্ল্যাটেই থাকে। আজকাল দেখিস না কত ফ্ল্যাটে মড়া আগলে বসে থাকার ঘটনা ঘটছে। দু'চার মাস মড়া আগলে বসে। পচে গন্ধ বেরুলে, পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশ ডাকলে তবে সৎকার হয়। তাও মড়া ছাড়তে চায় না। আসলে যে মড়া আগলে বসে, তার ঘাড়েও তো কোন বদ অশরীরী চেপে বসে আছে। আসলে কি জানিস মানুষ মানুষের সঙ্গে মন খুলে মেশেনা। কুকুর বেড়াল নিয়ে থাকতে ভালবাসে। মানুষ মানুষ থেকে দেবত্বে উত্তরণ চায় না। নিম্ন গতি চায়। কেবল আহার নিদ্রা মৈথুন নিয়ে থাকলে পশু সঙ্গ আনন্দ দেয়।"

"তা যা বলেছ।"

"যাকগে অনেক জ্ঞান দিয়ে দিলাম। তুই এখানে কেন এসেছিস বল?"

"আমি বললুম আমি করোনায় মরে এসেছি। ভব সাগরের পারে যাব বলে নৌকোয় উঠেছিলুম। কিন্তু মাঝি নামিয়ে দিলে বললে আগে..." কথা শেষ হল না দিবাদা বললে, "'আমি'টা বিসর্জন দিতে এসেছিস। আমি ঐ কাজ করি। সুপারি কিলার ছিলুম তো বহু পাপ জমেছে। পাপ খন্ডনে এই কাজ দিয়েছে। যেখানে পার্বতীর কানের কুন্ডল পড়েছিল সেই

কুন্ডে 'আমি' মানে অহংকার বিসর্জন দিলে তবে ভবসাগরের পারে যাওয়া যায়। আয় সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

মোক্ষধামের দিক থেকেও উৎকট ভূতের হাসি শুনতে পেলুম। জিগ্যেস করলুম, "ওখানে কারা?" দিবাদা বললে "ওরা সব তোলাবাজ, ধর্ষক, গুন্ডা বদমাস। ওরা রিলে ধর্না চালাচ্ছে। ভয় দেখিয়ে মোক্ষধামের দখল চায়।"

"দখল পাবে?"

"সে গুড়ে স্যান্ড। এখানে তো আর দাদা, দিদি, মন্ত্রী্ নেতার সুপারিশে ভোগদখল করা যায় না। সেই দাদা-দিদি, মন্ত্রী-নেতারা এখন চ্যালা-চামুন্ডাদের থেকে বিকট হাসির খিস্তি খায়। ওরা খুব ভয়ে আছে। বদ নেতা নেত্রীদের কোন ইজ্জত নেই।"

"বল কি গো!" আমি অবাক হয়ে যাই। আর কথা বাড়াই না। আরো কি জানব কে জানে। দিবাদা বলে, "ঐ সব বজ্জাতদের কথা ছাড়। আয় তোর কাজটা সারি।"

"হ্যাঁ চল।" চললুম দিবাদার সঙ্গে।

একদা সুপারি কিলার দিবানাথদা আমার 'আমি'কে বিসর্জন দিয়ে আমাকে শুদ্ধ করে দিলে। এখন আমি শুদ্ধ অশরীরী। দেখলুম নৌকো ঘাটে লেগেছে। সেই চেনা মাঝি যে আমায় এখানে এনেছিল। আমি তার নৌকোয় উঠে বসলুম। নৌকো ছেড়ে দিল। আমি এবার চলেছি ভব সাগরের পারে... ■

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: ডিসেম্বর সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ৩০ শে নভেম্বর, ২০২০।

ভুতু

অনিমেষ ভট্টাচার্য

গাব গাছেতে
বাস তার
দুধ দিয়ে
খায় ছাতু,
আদি নিবাস জামুরিয়া
মরে হয়েছে ভুতু।

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

এমনিতে সে ভূত ভালো
রাগ-টাগ নেই মোটে,
রাতদুপুরে স্নিকার পায়ে
রাস্তা দিয়ে ছোটে।

আসলে সে দিয়েছিলো
ম্যারাথনে নাম,
পা হড়কে টপকে গেলো,
বিধিই ছিলো বাম।

দুপুর রাতে ঘেমেনেয়ে
পুকুরপাড়ে বসে,
গন্ডা দুই মালপোয়া দেয়
পেটের মধ্যে ঠেসে।

যদি কেউ নিশির ডাকে
পুকুরধারে আসে,
ভুতু তাকে দৌড় করায়
মাঠের আশেপাশে।

এমনিতে সে ভূত ভালো
মালপোয়া দেয় খেতে,
পাখা দিয়ে বাতাস করে
বসিয়ে আসন পেতে।

কেউ যদি দেখতে চাও
বুকিং কোরো আগে,
ভুতুর নানা কেরামতি
রাতের নানা ভাগে ।।■
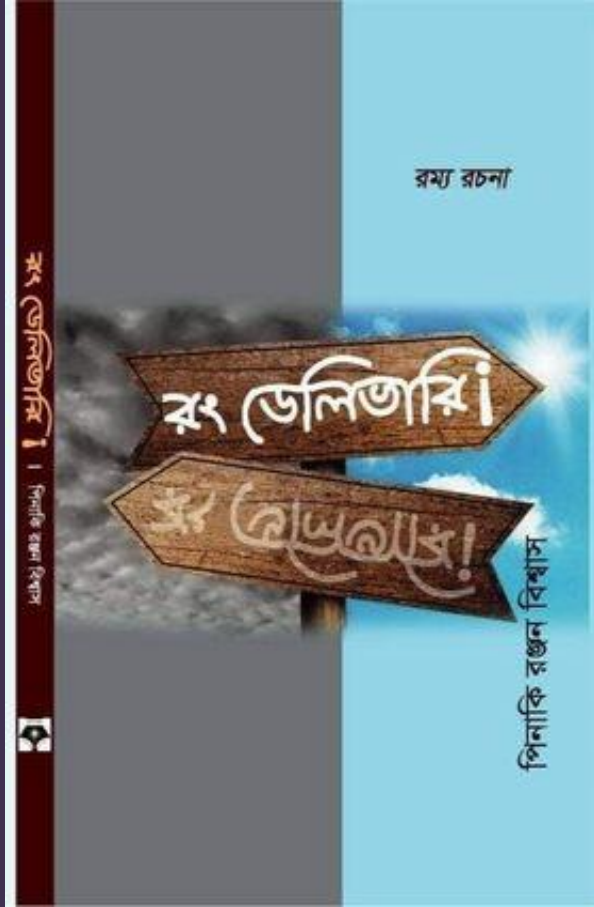
আত্মা-কাহিনী

সরজিৎ মণ্ডল

আমি তখন ক্লাস ইলেভেনে উঠেছি। এদিকে আমাদের বাড়ির অবস্থা যে খুব ভালো আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে তা বলতে পারি না। সুতরাং, কোন ইস্কুলের হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করার কথা ভাবতে শুরু করলাম। না, বেশি ভাবতে হয়নি। অতি সহজেই আমাদের পাশের শহরের এক স্কুলে হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করার সুযোগও পেয়ে গেলাম।

পরের দিনই বাড়ির সবার উপর এক প্রকার রাগ দেখিয়েই তল্পিতল্পা নিয়ে গিয়ে সেই স্কুলে ভর্তি হলাম। স্বপ্নের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতোই আমি সেই হোস্টেলের শেষ প্রান্তে একটা ছোট সিঙ্গেল রুমও পেয়ে গেলাম।

সিঙ্গেল রুম! আমার সেই উঠতি বয়সে থাকার জন্য আমি নিজেকে একটু একা হিসেবেই রাখতে চাইছিলাম। বিশেষ করে রাতটা। না, থাক সে কথা। যেটা বলছিলাম, সেরকম রুমে একা থাকা আমাকে মুগ্ধ করতে লাগল। বাড়িতে তো দাদা-বৌদিদের আর মা-বাবার শোওয়ার জায়গা দিতে দিতে আমিই শুতে জায়গা পেতাম না। তা সেই সময়, আমার এই হোস্টেলে সিঙ্গেল রুমে অর্থাৎ একা

পুরো এক বিছানায় আরামে শুয়ে রাত কাটানো স্বপ্নের ব্যাপার হয়ে পড়ল। আর অন্য স্বপ্ন দেখার দরকার হল না।

কিন্তু না, বিধাতা (বিধাতা কে? পরে ভাবব) আমার সে সুখ সইতে পারল না। আর যাকে দিয়ে বিধাতা আমার সে সুখ কেড়ে নিল, তার ওপর কি তার কন্ট্রোল আছে? তাও জানি না। কিন্তু কে সে সুখ সইতে দিল না ? বলব, বলব। সেটা বলতেই তো আমার আজকের এই গল্প। গল্প! না, সত্যি আলোচনা। সৎভাবে সত্যি কথাটাই বলতে চাই। সুতরাং বলি...

*** *** ***

প্রথম দুটো দিন ভালভাবে কাটার পরই মাত্র তৃতীয় দিনের গভীর রাতে হঠাৎ আমাকে বিছানা থেকে কে ঠেলে নামিয়ে দিল! ভাবলাম, স্বপ্ন দেখছি না তো? না, স্বপ্ন দেখা তো ভুলেই গেছিলাম। আমি জেগে উঠে আলো জ্বালালাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, হয়তো নিজে বিছানা থেকে পড়ে গেছি। তাই আবার শুয়ে পড়লাম। কিন্তু এবার ভয়ে আর ঘুম আসতে চাইল না। আলো জ্বালিয়ে বিনিদ্র হয়ে অনেকক্ষণ বিছানায় পড়ে রইলাম। মাঝরাত! বাইরে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক। জানালা দিয়ে দেখলাম, নিশ্বাস চেপে রাখা শুনশান রাতের বিকট কালো চেহারা! অন্ধকার সমুদ্র! সেখানে কোন ঢেউ নেই। আছে কেবল বিশাল নীরবতা আর তার অসীম গভীরতা। ঘুম না আসাতে বিরক্ত লাগতে লাগল।

শেষে ভাবলাম, না, আলোটা নেভালে বোধহয় ঘুম আসবে। তাই আলো নেভালাম। আর তারপর, নিজেকে কিশোর না, যুবক ভেবে সাহস করে ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়লাম।

পাঁচ মিনিটও হয়নি বোধহয়; আমার চোখের পাতা চোখের উপর শুয়ে ছিল কেবল। কে হঠাৎ আমাকে তুলে বাঁই-বাঁই করে ঘুরিয়ে সে বিছানায় আছড়ে ফেলল। আমি সেসময় চেয়ে থেকেও সে অন্ধকারে কাউকে দেখতে পেলাম না। কেবল দেখলাম, আমি বিছানায় পড়ে আছি। আবার আলো জ্বালালাম। এই এত রাতে ভূতের ভয়ে ঘরের বাইরে এসে কাউকে তোলা ঠিক হবে না ভাবলাম। সবাই ঘুমোচ্ছে। তাছাড়া জানি হোস্টেলের ছেলেরা তাহলে পরেরদিন থেকেই আমাকে ক্ষেপাবে এ নিয়ে। তাই কাউকে কিছু না বলে, আবার সেই বিছানায় এসে বসলাম। বলাই বাহুল্য যে তারপর সে রাত আমাকে তন্দ্রাহীন হয়েই রইতে হল।

পরের রাত অনেক সাহস নিয়ে আলো জ্বালিয়ে শুলাম। শুয়েই আনমনা হয়ে অন্য কিছু ভাবতে লাগলাম। ভাবলাম, আমি বড় হয়ে কী হব বা কাকে জীবনসাথী হিসেবে পাব? ইত্যাদি। উঠতি যুবকদের মনে যা হয় আর কি? কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। মাঝরাতে ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ মনে হল, কেউ আমার বিছানার তলায় হাত ঢোকাল আর সে অনুভূতিতে সাড়া দেওয়ার আগেই আমাকে সে হাত শক্তভাবে ধরে তুলে গতকালের মতো আবার সেই বন

বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে মুহূর্তমধ্যে সেই বিছানায় আছড়ে ফেলল।

কিন্তু, কী আশ্চর্য! আমি এবার চোখই খুলতে পারলাম না সে সময়। যেহেতু আলো জ্বালা ছিল চোখ খুলতে পারলে নিশ্চয় কে তা দেখতে পেতাম। কিন্তু তা হল না। যেটা হল সেটা হচ্ছে, আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম, এক আশ্চর্যজনকভাব। আমি দেখলাম, আমার পা যেদিকে ছিল, বিছানায় সেদিকে আমার মাথা আর পা উল্টোদিকে, মানে জানালার দিকে ছিল না! অর্থাৎ, আমি যেটুকু ভাবছিলাম, আমার মনের ভুল বা স্বপ্ন তা আর ভাবা গেল না। এটা যে সত্যিই কোন ভূতের কাজ, তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। না, আর তো ঘুমের কোন প্রশ্নই আসে না? সুতরাং, সব আলো জ্বালিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বসে রইলাম। সারারাত এভাবে আলো জ্বালিয়ে রেখে বসে থেকেই কাটিয়ে দেব ভেবে নিলাম। একটা বই নিয়ে বসে পড়লাম।

এক দেড় ঘণ্টা বসে কাটানোর পর বিরক্ত হয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম, ভোর হয়েছে কি না দেখতে। বাইরে বেরিয়ে আসতেই বুঝলাম, এখনো গভীর রাত। চারদিক নিকষ কালো অন্ধকারের কম্বল গায়ে নিয়ে পৃথিবী নিথর হয়ে ঘুমিয়ে আছে। প্রকৃতি তার সময় কড়ায় গণ্ডায় মেটাতে রাতকে দিনের হাতে এখনো তুলে দিতে চায়নি।

আচমকা আমার দৃষ্টি পড়ল আমার রুমের সামনে থাকা

বাইরে একটা মস্ত গাছের মাথার ডালে। সেখানে লম্বা কেউ যেন বসে আছে বলে মনে হল। তার জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়া হাওয়া হয়ে আমাকে এসে ঠেলে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে চাইছিল হয়তো। তাই, ভীষণ ভয় পেয়ে আবার ঘরে এসে ঢুকলাম। ভাবলাম, এখানে লাইট জ্বালিয়ে ফ্যান চালিয়ে ভোর হওয়া না পর্যন্ত জেগে থেকে কাটিয়ে দেব। ঘরে ঢুকতেই ভস করে কী একটা ওষুধের গন্ধ নাকে লাগল। গন্ধটা কিছুক্ষণ আগেও ছিল না। অথচ, এখন এমনই প্রবল মনে হল যে নাক চাপা দিতে বাধ্য হলাম। এমনকি এবার আমার সেই বিছানাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জলও পড়ে আছে দেখতে পেলাম। বিছানাতে ছোট বাচ্চারা যেমন প্রস্রাব করে দিলে কাঁথা ভিজে যায় ঠিক সেরকম মনে হল। আমি যে তা করিনি তা একশো ভাগ সুনিশ্চিত হয়েও ব্যাপারটাকে আমল দিলাম না। বরং নিজেকেই বললাম, ভয়ে তুই বিছানায় প্রস্রাব করে ফেললি? লোকে কী বলবে? তুই না আঠারো বছরের যুবক?

নিজেকে যুবক ভেবে সেরকম কোন মোহময়ী যুবতীর খোঁজে একটুক্ষণ বসেছি কি না বসেছি, অমনি হঠাৎ ঘড়ঘড় করে ফ্যানটা বন্ধ হয়ে গেল। আর তারপর লাইটটাও নিভে গেল। ভাবলাম, তাহলে কি লোডশেডিং হল? কি জানি? হবে হয়তো? তা চেক কীভাবে করা যায় ভাবতে ভাবতেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বাইরে সবার ঘরের আলো

বন্ধ দেখে ধরে নিলাম, কারেন্ট গেছে।

একটুক্ষণ বসে থেকেই আমার মনে হল, লোডশেডিং নাও হতে পারে, বাইরের অন্য রুমের ছেলেরা লাইট বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে হয়তো। আর এ ভাবনা হতেই আমার কেমন একটা মারাত্মক ভয় হল। সেই ভয় আরও ভয় দেখাল। আমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হঠাৎ মাথায় খেলে গিয়ে বলল, "লোডশেডিং হলে আগে তো লাইটটা বন্ধ হত পরে ফ্যান। কিন্তু, আমার ঘরে তো ফ্যানটা আগে ঘড় ঘড় করে বন্ধ হতে শুরু করেছিল আর তারপর লাইটটা অফ হয়ে গেছিল। অর্থাৎ..."

আমি এবার পাগলের মতো সেই রুমের দরজার সামনে এসে ইলেকট্রিক সুইচে হাত রাখলাম। আর তখুনি আমার শরীর অবশ হয়ে গেল। না, কারেণ্টে বা শক লেগে না, শকিং জ্ঞানানুভবে। আমি দেখলাম, আমার ফ্যান ও লাইটের সুইচ দুটো ওপরের দিকে ওঠানো, মানে অফ পজিশানে। তার মানে! সুইচ দুটো অফ করল কে?

দৌড়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। আর বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেলাম, দিনের আলো রাতের কালোকে ফর্সা করতে শুরু করে দিয়েছে। হ্যাঁ, ভোর হতে শুরু হয়েছে বুঝে গেলাম।

একটুক্ষণ পায়চারি করে যখন দেখলাম, সত্যি দিনের আলো। প্রকৃতি মা তাঁর ঝাঁপি খুলে চারদিকে আলো ছেড়ে দিতে শুরু করেছেন। তখন আবার ঘরে এসে ঢুকলাম। না,

এবার দিন, আমার কোন ভয় নেই। ভূতটা নিশ্চয় সূর্যের আলোয় সুইচটা অফ করতে পারবে না? তাছাড়া আমার পাশের রুমটাই যে ওয়ার্ডেনের রুম। সেখানে সারাদিন লোকের সমাগম থাকে। সুতরাং, দিনটা আমার কাছে কোন ভয়ের নয়। এ দৃঢ় ধারণা আমাকে এতটাই শক্তি দিল যে সারারাত না ঘুমিয়ে শক্তিহারা আমি কখন আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে গেছিলাম জানি না, তবে ঘুম ভাঙতেই হঠাৎ বিছানা থেকে ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম। ভয় না, এবার ভূতের ভয়ে নয়, ঘড়ির সময় দেখে। কারণ, ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজছিল। আমার স্কুলে আজ আর যাওয়া হবে না। কারণ, স্কুল শুরু হয়ে গেছে কখন সেই ন'টায়। ভূতটা আমাকে অন্ততঃ সেই সকালটাতে শান্তি দেওয়ার জন্য ওর উপর কৃতজ্ঞ হলাম (!)।

মেসে এসে বুঝলাম, ব্রেকফাস্ট শেষ। স্বাভাবিক। আমার জন্য এই এত দেরি করে কেউ তো আর সকালের খাবার রাখবে না। এখানে মা নেই, আমি খেলাম কি না খেলাম তাতে কারও কিছু যায় আসে না? মা'র কথা মনে পড়তেই মনটা কেমন হয়ে গেল! হোস্টেলের কুক আমাকে স্কুলে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল। আমিও এটাই চাইছিলাম, যে কারণটা কাউকে বলি। বলা উচিত। বললাম, "আমার রুমে ভূত আছে মনে হয়। রাতের বেলায় বিছানায় আছড়ে ফেলে।"

সে কুক অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর সে জানতে চাইল কোন রুমে থাকি আমি? ব্যস, যেই আমি বললাম, "এ ১০১-এ," অমনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, "সর্বনাশ! ও রুমটা তো কাউকে দেওয়ার কথা নেই। কে তোমাকে এ্যালও করেছে ওটা?"

আমি বললাম, "কে আবার? সুপার। সুপার রুমটা আমাকে দেখাতেই আমি এক কথায় নিয়ে নিয়েছি। কাবার্ডে দরজা পর্যন্ত আছে। এরকম সিঙ্গেল রুম কেউ কি ছেড়ে দেয়?"

"দেয়, বাধ্য হয়।"

"কেন? ওটায় কি সত্যিই ভূত আছে?"

কুক গোল গোল চোখ পাকিয়ে বলল, "জানি না সত্যিটা যদি বলি, তাহলে সুপার আমাকে কী করবে? তবে সত্যিটা আমার বলতে খুব ইচ্ছে করছে।"

"ইচ্ছের জন্যই না। বলুন, আমার প্রাণ বাঁচাতে। আমি এখানের কাউকে বলব না।"

"তাহলে বলছি শোনো।"

"আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমি তখন সবে নতুন জয়েন করেছি। আমার কাজ রান্না করা। তা, এই একশো দেড়শো ছেলের মধ্যে আমাদের সাধারণতঃ হিসেব থাকে না, কোন ছেলে খেল কি না খেল? তাই আমরা জানতেও পারি না কেউ আজ হোস্টেলে আছে কি নেই? অনেকে তো রেগিংএর ভয়ে না বলে হঠাৎ বাড়ি চলে যায়, আবার কেউ

কেউ এমনিতেই বাড়ি যায় কখনো কখনো। সেটা ছিল বছরের মাঝামাঝি এক পরীক্ষার সময়। সকালে সবাই খাওয়া-দাওয়া করে পরীক্ষা দিতে বেরিয়ে যায় আর বিকেলে ফেরে। সেবার সেদিন এই রুমে থাকা একটি ছেলে পরীক্ষা দিতে যায়নি। বিকেল বেলায় তার এক বন্ধু ওর রুমে আসে আর বার বার দরজা ধাক্কা দিয়েও ওর সাড়া না পাওয়াতে চেঁচিয়ে ওঠে। রুমটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল বলে বন্ধুর সন্দেহ হয়েছিল কোন বিপদের। তা আমরা সবাই ছুটে আসি। তারপর দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখি ছেলেটি গলায় দড়ি নিয়ে ফ্যানে ঝুলছে।

আমার শরীরের রক্ত জল হয়ে গেল। কয়েক দিন আগেই ওর মা-বাবা ঘুরে গেছিল ওর কাছে দেখা করে। আমরা ছেলেটির মৃত্যুর কারণ খোঁজার চেষ্টা করলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওর বিছানার তলা থেকে একখানা ছোট কাগজ পেলাম। সেখানে লেখা ছিল, প্রসাবদ্বারের কোন গোপন রোগে আক্রান্ত হয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। এর জন্য আমি ছাড়া কেউ দোষী নয়। আমার দপ করে মনে হয়ে গেল, সেই বিছানার তলায় হাত! ওষুধের গন্ধ আর বিছানায় জল... আমি ভীষণ শিহরিত হয়ে বললাম, "ঠিকই বলেছে? আমিও কাল বিছানায় জল পেয়েছিলাম।"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। ওটা জল ছিল না, হয়তো ভূতটার প্রস্রাব ছিল।"

— এ্যাঁ !

— হ্যাঁ।

— তাহলে কি ও এখনো...?

"হ্যাঁ, ও এখনো ওই রুমেই আছে। দু'বছর আগে পর্যন্ত ওই রুমে কাউকে না কাউকে রাখার চেষ্টা হত। কিন্তু, প্রত্যেকবারই নতুন বোর্ডার থাকার দুদিন পরেই তাকে তোমার মতো নির্যাতিত হয়ে রুম ছাড়তে হত। জানিনা, ওয়ার্ডেন মানে সুপার কেন আবার রুমটা অ্যালট করার চেষ্টা করে তোমাকে দিয়েছেন?"

"না, আমি আজই এই রুম ছেড়ে ঘরে চলে যাব। দু-তিন দিন পরে এসে সুপারের সাথে দেখা করে নতুন রুম নেব।"

"আমি তোমাকে এ ঘটনাটা বললাম বলে কাউকে বলে দিও না।"

"না, বলব না। তোমার কোন ভয় নেই গৌতমদা। এখন, তুমি যদি আমার সাথে একটু রুমটাতে আসো তাহলে আমি আমার জিনিসপত্র বের করে নিই। তারপর, আমি এখনই বেরিয়ে যাব। মনটা ঠিক নেই, বাড়ি যেতেই হবে।"

"ঠিক আছে চল।" গৌতমদার সাহায্য নিয়ে সেই রুমে রাখা আমার জিনিসপত্র নিয়ে তখুনি বেরিয়ে গেলাম... ■
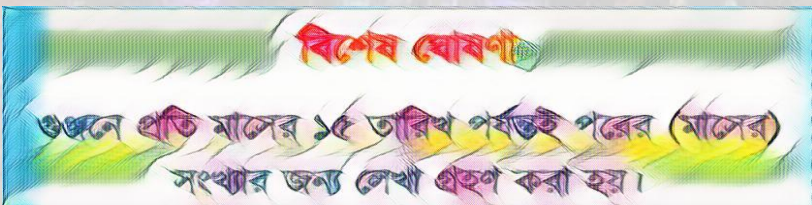
সেদিন সন্ধ্যায়

স্বাগতা পাঠক

অফিস থেকে বেরিয়ে বাস স্ট্যান্ডে আটকে গেলাম, বৃষ্টির তোড়জোড়টা বেশ বেড়েছে। অফিসে বসে কাচের জানলার বাইরে মেঘলা আকাশটা দেখে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম মুষলধারায় আজ নামবে বারিধারা। কিন্তু আমার বাড়ি ফেরার পথে এমন ব্যগড়া দেবে সেটা আশা করিনি। নিজেকে কোনো মতে বৃষ্টির ঝাপটা থেকে বাঁচিয়ে শেডের নীচে সরে দাঁড়ালাম। বাস স্ট্যান্ডে তখন আমি ছাড়াও ছিলো একজন মাঝ বয়সি ভদ্রলোক। আর একটি ছোটো বাচ্চা ছেলে – ফুটপাথবাসী। পোশাকে-আশাকে দরিদ্রতার ছোঁয়া, কোলে একটা কুকুর ছানাকে নিয়ে বেঞ্চের উপর গুটিসুটি মেরে বসে আছে।

এই লকডাউনের পর থেকে বাসের বড্ড ঝক্কি পোহাতে হয়, এক ঘণ্টায় একটা বাস আসে। উফফ, দারুণ বিরক্তিকর ব্যাপার।

ভেজা রাস্তার উপর আলোর প্রতিচ্ছবি পড়েছে। আর মাঝে মাঝেই সেই ছায়াগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে হুসহাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। আনমনে আলো আঁধারিতে ভরা রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, হঠাৎ একটা পরিচিত ডাকে সম্বিত ফিরলো, দেবমাল্যদা।

পিছুটান

হাসি মুখে মাথায় একটা রুমাল চাপা দিয়ে বৃষ্টিতে আধ ভেজা হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দেবমাল্য সেনগুপ্ত ওরফে আমাদের দেবুদা। ২০১২ সালের বাংলা অনার্সের ব্যাচের সেরা প্রাইভেট টিচার। কলেজ পাশ করার পর আর কোনো যোগাযোগ ছিলোনা, টিউশন পড়তে যেতাম ওনার কাছে। বছর দুই আগে কোনো এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম আগরপাড়ার কাছে একটা হাইস্কুলে চাকরি পেয়েছেন। গ্রামের ছেলে শহরে এসে থাকতেন পড়াশুনার জন্য। যেমন ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলেন ঠিক তেমনই টিচার। আমাদের সকলকে ভাই বোনের মতো স্নেহ করতেন।

আমিও এতো বছর পর দেবুদাকে দেখে খুব খুশি হলাম হাসি মুখে বললাম, "আরে খবর কি আপনার, কেমন আছেন বলুন?"

"এই তো চলে যাচ্ছে। তোদের খবর বল?" পড়াশুনা শেষ করার পর তো দাদাকে ভুলেই গেছিস। কোনো যোগাযোগ রাখিসনি। একটু লজ্জা পেয়ে বললাম, "না আসলে দাদা ওই কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম কিনা।" একটু হাসি মুখে দেবুদা বললেন, "হ্যাঁ সেই ব্যাপার। পল্লবটা তাও মাঝে মাঝে ফোন করত, বছর খানেক হলো সেও বেপাত্তা।"

পল্লব আমাদেরই ক্লাস মেট ছিলো। সত্যি বলতে ছুটে চলা এই ব্যস্ত জীবনে বন্ধু আর বন্ধুত্বগুলো কখন যেন

পেছনে পড়ে যায় বুঝতেই পারিনা। দেবুদার সাথে কথা বলতে বলতে খেয়াল করলাম, আমার সাথেই ওই বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা অচেনা ভদ্রলোকটি আমাদের দিকে কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে খুব অস্বস্তি হচ্ছিলো আমার। এর মধ্যে দেবুদা বললেন, “বাড়ি ফিরবি তো?”

“হ্যাঁ আর বলবেন না সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু বাসের দেখা নেই।”

দেবুদা হেসে বললেন, “এখনও ঘণ্টা খানেক ধরে রাখ, মুষলধারার বৃষ্টির জন্য রাস্তায় জল জমে একাকার কান্ড। জ্যামে পড়ে ওই জল কাটিয়ে আসা তো কম ঝক্কির কথা নয়।”

“খুব মুশকিলে পড়লাম যে...” দেবু দা হাত ঘড়িটার দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, “যাবি তো বারাসাত কতক্ষণ আর লাগবে? চল যতক্ষণ না বাস আসে আমরা ওই সামনের দোকানটা থেকে একটু চা খেয়ে আসি।” প্রস্তাবটা মন্দ নয়। একটু মাথা বাঁচিয়ে দৌড়ে গেলে চায়ের দোকানে পৌঁছনো যায়। রাস্তার বাঁদিকে একটু এগিয়ে, একটা দেওয়ালের পাশে ঘুপটি মতো একটা চায়ের দোকানে মিটমিট করে একটা বাল্ব জ্বলছে। আর কিছু না ভেবে আমি আর দেবুদা ছুট দিলাম। দোকানে পৌঁছে রুমাল দিয়ে একটু হাত মুখ মুছে নিলাম। দোকানে লোকজন নেই শুধু একজন বয়স্ক দোকানী ছাড়া। দু’কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে দেখলাম বৃদ্ধ দোকানীটি একবার ভুরু কুঁচকে আমার দিকে

তাকিয়ে চায়ের জল চড়াল। দেবুদা আর আমি দোকানের এক পাশে রাখা বেঞ্চীটাতে বসলাম। সবে উনি একটা সিগারেট ধরিয়েছেন, আমি বললাম, "ওটাতে আমার বড় কষ্ট একদম ধোঁয়া সহ্য হয় না দাদা।"

দেবুদা একটু লজ্জিত হয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা ভেজা রাস্তার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমি বললাম, "তারপর, বলুন কেমন চলছে আপনার স্কুল আর পড়ানো?"

"সে ভালোই চলছে রে স্বর্ণা।" এতক্ষণ খেয়াল করিনি দেবুদা আগের থেকে অনেক বেশি রোগা হয়ে গিয়েছেন। আমি একটু ইয়ার্কি করেই জিজ্ঞেস করলাম, "আর কতদিন একা থাকবেন, এবার একটা বিয়ে থা করুন। বৌদি এসে আপনার যত্ন করতে পারবেন। চেহারার কি হাল বানিয়েছেন!" একটু মুচকি হেসে দেবুদা বললেন, "সে তো বিয়ে একরকম ঠিকই হয়ে গিয়েছিলো রে। কিন্তু শেষ মেস আর হলো না।"

"সেকি? তা হলো না কেন?"

"সে অনেক বড় ঘটনা।"

"আপত্তি না থাকলে বলুন শুনি, হাতে তো এখনও বেশ কিছুটা সময় আছে।" এর মধ্যে আমাদের জন্য গরম চা এসে গেলো। আমি চায়ের কাপে এক চুমুক দিয়ে দেবুদার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। দেবুদা বলতে আরম্ভ করলেন, "এই আগের বছরের কথা বুঝলি। গ্রামের বাড়ি

পিছুটান

থেকে মায়ের ফোন এল আমার জন্য একটি সু-পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেছে, আমি যেন তাড়াতাড়ি গিয়ে একবার দেখে আসি। এইদিকে স্কুলের চাপ, ছুটি একদম নেই। আমি মাকে বললাম তোমরা দেখে শুনে পছন্দ করো, আমি গিয়ে না হয় একবার দেখে নেব আর আমার একটা ছবি পাঠিয়ে দাও মেয়ের বাড়িতে তারাও দেখে নিক। কথা মতো মা তাই করলো। মাস দুই পরেই পুজোর ছুটি পড়বে তখন চেষ্টা করবো যাওয়ার...

তবে কপালের ফের এমন অসুস্থ হয়ে পড়লাম যে দুর্গা পুজোর ছুটিটা মাটি হলো, যেতে পারলাম না গ্রামে। তবে কথা দিলাম কালী পুজোর ছুটিতে নিশ্চই যাবো। যে কথা সেই কাজ। কালী পুজোর দিন পাঁচেক আগে আমি গ্রামে ফিরলাম। যথারীতি মেয়েও দেখা হলো। বড়রা কথা বলে ঠিক করলো এইখানেই আমরা এগোব। কালী পুজোর পর ভালো দিন দেখে বিয়েটা সেরে ফেলা হবে। দুর্গাপুজোতে যেতে পারিনি তাই কালী পুজোতে গ্রামেই থেকে গেলাম।

আমাদের গ্রামে তেমন বড়-সর ঘটা করে পুজো হয় না। কিন্তু পাশের গ্রামে নাকি বেশ জমিয়ে কালী পুজো হয়। বড় অনুষ্ঠান হয়। সে যাই হোক, কলেজ লাইফ থেকেই আশপাশের গ্রামে আমার খুব নাম ডাক ছিলো, সকলেই মাস্টারমশাই বলে ডাকতো আমাকে। তো পাশের গ্রাম থেকে একদল ছোকরা হঠাৎই একদিন সকাল বেলায় বাড়ি

এসে হাজির, ওদের দাবী, "তুমি যখন এইবার গ্রামেই আছো দাদা আমাদের এবারের পুজোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তোমাকে সঞ্চালনার কাজটা করতে হবে।" কলকাতায় আসার আগে, গ্রামের অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার কাজ করতাম টুকটাক। সকলের পছন্দও হতো কিন্তু অনেকদিন তা ছেড়েছি। অনেক করে না করলাম, তা কিছুতেই তারা ছাড়তে নারাজ। শেষে রাজী হলাম। কালী পুজোর পরদিন অনুষ্ঠান হবে, শহর থেকে নাকি কি সব টিভি আর্টিস্ট আসবে। সে যাই হোক অনুষ্ঠানের দিন সন্ধ্যে বেলা পৌঁছে গেলাম সময় মতো। পাশের গ্রামেই ছিলো গন্তব্য, তাই একটা টোটো রিক্সা ধরে চলে গেলাম। বেশ জমজমাটি অনুষ্ঠান চললো অনেক রাত পর্যন্ত। আশপাশের গ্রাম যেন সব ভেঙে পড়েছিল সেই রাতে।

কিন্তু সব মিটিয়ে অনুষ্ঠান যখন শেষ হলো তখন রাত পৌনে একটা। সকলেই মোটামুটি ক্লান্ত আর ঐখানে যারা কর্মী ছিলো তখনও তাদের কাজ শেষ হয়নি। তাও কিছু ছেলে ছোকরা আমাকে বললো, "দাদা অনেক রাত হয়েছে তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।" বড্ড লজ্জায় পড়ে গেলাম, বাচ্চা ছেলেগুলো কিনা আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসবে, না করে দিলাম। আমি বললাম, "না আমি নিজেই যেতে পারবো।" তাতে ওরা আর বেশী জোর করলো না। তবে ফেরার পথে জোর করে কিছু মিষ্টি আর লুচি মাংস প্যাকেট

করে দিলো, কতো করে বারণ করলাম শুনলোই না। ঐখান থেকে পায়ে হেঁটে আমার বাড়ি খুব বেশী হলে মিনিট পঁচিশ সময় লাগে, ওতো রাতে কোনো ভ্যান বা রিক্সা পাবো না তাই দেরি না করেই বেড়িয়ে পড়লাম।

ঘড়িতে দেখলাম রাত তখন একটা পনেরো। নিজের মনেই একা একা হাঁটছি আর গুনগুন করছি। অমাবস্যার রাত ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তায় কিছু কিছু জায়গায় আলো ছিলো কিন্তু একটু গ্রামের ভেতর ঢুকতে সে যেন পিচ-কালো অন্ধকার। তবে অন্ধকারে আমার চোখ শয়ে গিয়েছিলো ততক্ষণে। মিনিট সাতেক হাঁটার পর হঠাৎ নজরে পড়ল একটা বেড়াল আমার পিছু নিয়েছে। সাদা ধপধপে বেশ ধুমসো মতো বেড়াল। আমি স্মার্ট ফোন আগাগোড়াই ব্যবহার করি না জানিস তো, সাথে একটা ওই কি’প্যাড মোবাইল। তারই টর্চের ক্ষীণ আলো ফেলে দেখলাম আমার পেছনে থেকে বেশ কিছুটা দূরে জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আগন্তুকটি।

আমি মনে মনে ভাবলাম, যাক এই মাঝ রাতে ফাঁকা রাস্তায় একটা সঙ্গী পাওয়া গেল। আমি যখন দাঁড়িয়ে পেছন ঘুরে আলো ফেলে দেখলাম তখন সেই বিড়ালটিও আমার থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। মোবাইলটা হাতে রেখেই আমি সামনে ফিরলাম বাড়ির দিকে এগোব বলে। সামনে ফিরতেই আমার সর্বাঙ্গে যেন একটা বিদ্যুৎ

খেলে গেলো। দেখি আমার সামনে ঠিক হাত খানেক আগে ওই সাদা বেড়ালটাই এসে বসেছে। ঠিক আগের মতোই আমার দিকে তাকিয়ে আছে জ্বলজ্বলে চোখে। মুহূর্তের মধ্যে ওটা সামনে আসলো কি করে! ভাবতেই সত্যি বলতে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি সাথে সাথেই আবার পিছন ঘুরে দেখলাম না কোথাও কিছু নেই।

তারপর কয়েক সেকেন্ডের জন্য সামলে নিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম এটা অন্য কোনো বিড়াল হবে আর আগের বিড়ালটা কোনো ঝোপের আড়ালে পালিয়ে গেছে হয়তো। এই ভেবে আমি আবার বাড়ির পথ ধরলাম। ওই বিড়ালটাকে পাশ কাটিয়ে আসার সময় দেখলাম তখনও সেটা আমার দিকে জ্বজ্বলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সামনে এগিয়ে এসে আর একবারও সাহস হয়নি পিছন ফিরে তাকাবার। এবার একটু দ্রুত পা চালালাম। এখনও বাড়ি পৌঁছাতে অনেকটা পথ বাকি। কোনো রকমে ইষ্ট দেবতার নাম নিয়ে হেঁটে চলেছি। অন্ধকারে তখন আমার চোখটা আরও ভালোভাবে শয়ে গেছে। সমস্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি, রাস্তা, বাড়ি ঘর, ঝোপঝার। একটু দূরে যেতেই হঠাৎ একটা জিনিস অনুভব করলাম, এবং অনুভূতিটা খুব তীব্র। মনে হলো আমার পাশে ঠিক আমার সাথে সাথেই কেউ একজন হেঁটে চলেছে। কিন্তু খুব ভালো ভাবেই বুঝতে পারছিলাম কোনো মানুষ নয়। কারণ এমন একটা অনুভুতি যা আগে

কোনো দিন হয়নি। অনেকটা সাহস জুটিয়ে বাঁদিকে একটু ঘাড় ফেরালাম। যা দেখলাম তোকে আর কি বলি... সে একটা বিরাট লম্বা কালো ছায়া, কোনো আকার আকৃতি নেই তার। এবার নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ভেবে বসেছিলাম ওটা আমার নিজের ছায়াই হবে। কিন্তু সান্ত্বনা দিতে গেলেও একটা স্ট্রং লজিক দরকার। এই ঘটঘুটে অন্ধকার অমাবস্যার রাতে কোনোভাবেই কোনো কিছুর ছায়া পড়তে পারে না। এর পরমুহূর্তে আর কিছুই ভাবতে পারি না। চোখ মুখ বন্ধ করে দিলাম ছুট। ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালাম আমার ছোটো কাকুর বাড়ির সামনে। আমাদের বাড়িটা কাকুর বাড়ির পেছনের দিকে রাস্তা ঘুরে যেতে হয়। তখন হাঁপাতে হাঁপাতে যেন আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড়, এক পা এগোনোর শক্তি নেই। কাকুর বারান্দার সিঁড়িতে বন্ধ গ্রীলের সামনে বসে হাঁপাচ্ছি। হঠাৎ খেয়াল করলাম অন্ধকার ঘরের বারান্দা থেকে গ্রীলের ফাঁক থেকে একটা সাদা মতো বেড়াল বেড়িয়ে যাচ্ছে আমার পাশ কাটিয়ে ঠিক যেমনটা রাস্তায় দেখেছিলাম। ততক্ষণে আমার বুকের ভেতর জল শুকিয়ে গেছে। আর ঠিক তখনই কানে এলো একটা কান ফাটা বাচ্চার কান্না, অন্ধকার চিড়ে যেন রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে।

আমার ছোটো কাকার একটা আট মাসের বাচ্চা আছে, আমি নিশ্চিত ছিলাম সে কাঁদছে। এই ভাবে কাঁদছে কিন্তু

পিছুটান

কাকু কাকিমা চুপ করাচ্ছে না কেন? নিজের মনেই বলে উঠলাম। আমি আবার ভাবলাম ওরা হয়তো ঘুমোচ্ছে অঘোরে তাই টের পাচ্ছে না। উঠে দাঁড়িয়ে গ্রীলে ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি শুরু করলাম তখনও কেঁদেই চলেছে বাচ্চাটা, এতো ডাকাডাকির পর কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না দেখে আমি খুব রেগে গেলাম। প্রায় দশ মিনিট পর বিরক্ত হয়ে বাড়ি চলে যাবো ভাবছি এর মধ্যে আমার মনে পড়ে গেলো একটা ব্যাপার। আর সেটা মনে পড়তেই আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল। দুর্গাপুজোর অষ্টমী থেকে কাকু কাকিমা কেউ বাড়ি নেই, ওরা কাকিমার বাপের বাড়ি গিয়েছে। আর বলে গেছে কালী পুজো সেরে ফিরবে। কথাটা মনে পড়তেই আমার শরীর শিরশির করে উঠলো, ওরা বাড়ি নেই, তবে বাচ্চার কান্না আসছে কেন ওদের বাড়ি থেকে? এই সব ভাবতেই আমার মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। একটু পরে খেয়াল করলাম, বাড়ির গেটে বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। মনটা এক অজানা আতঙ্কে ভরে গেলো। এবার আর সাহস হলো না ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকার। মনে মনে ঠিক করছি চোখ বন্ধ করে বাড়িতে ছুট লাগাবো, আর কোথাও দাঁড়ানো চলবে না। বাড়ি যাবো বলে যেই পিছন ঘুরে দাঁড়িয়েছি ওমনি দেখি সেই কালো অন্ধকার ছায়াটা ঠিক আমার সামনে এসে আচমকা উদয় হয়েছে। পর পর এতো কিছু ঘটে চলেছিলো

আমার সাথে, শেষ মুহূর্তে আমার স্নায়ুগুলো আর বেশি প্রেসার নিতে পারে নি। ওই ছায়া মূর্তি দেখার সাথে সাথেই আমি তো অজ্ঞান।” এই পর্যন্ত বলে দেবুদা থামলেন। আমি যেন পুরো ঘটনাটা নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম। শুকনো গলায় ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তারপর?’

দেবুদা রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “ওই দেখ বৃষ্টি থেমেছে আর বারাসাতের একটা বাস দেখছি এই দিকেই আসছে।” সত্যিই তো বাস আসছে। তাড়াহুড়ো করে ব্যাগ থেকে টাকা বের করে মিটিয়ে দিলাম চায়ের দাম। বাসটা কাছাকাছি আসতেই উঠে পড়লাম। বাসের দ্বিতীয় সিঁড়িটায় পা দিতেই মনে পড়ল কই দেবুদাকে জিজ্ঞেস করা হলো না তো, এখন তিনি থাকেন কোথায়? এমন কি ফোন নাম্বারটা অবধি নিলাম না। ইস্ কি লজ্জার কথা বাসে ওঠার আগে একবার শেষ বিদায়ও জানলাম না। একটু অপরাধীর দৃষ্টি নিয়েই ফিরে তাকালাম একবার চায়ের দোকানটার দিকে। ফিরে তাকিয়ে আমি যেন বোকা বনে গেলাম। ফাঁকা দোকানে তখনও মিটমিট করে আলো জ্বলছে। কই দেবুদা! কেউ নেই... মুহূর্তের মধ্যে লোকটা গেলো কোথায়? দরজার পাশেই থাকায়, একটু বাইরের দিকে ঝুঁকে দেখলাম, কিন্তু কই রাস্তায়ও তো কোনো লোকজন নেই। ভেতরে গিয়ে, জানলার পাশে বসে ভাবতে লাগলাম গল্পটা পুরো শোনা হলো না। কেনই বা বিয়ে ভাঙলো, সেটাও তো জানা হলো

না। কোনো যোগাযোগ করার সুযোগও নেই। হঠাৎ করে পল্লবের নামটা মাথায় আসলো, দেবুদা বলেছিলেন পল্লব মাঝে মাঝে দেবুদাকে ফোন করতো তবে ও নিশ্চই জানে দেবুদার নাম্বার। কিন্তু পল্লবের নাম্বার আমার কাছে নেই, তবে ফেসবুকে সে আছে আমার বন্ধু তালিকায়। ফোনটা খুলে ফেসবুকে ওকে একটা মেসেজ করলাম দেখলাম ২ঘণ্টা আগে অনলাইন ছিলো পল্লব। আশা করি মেসেজটা দেখলে রিপ্লাই দেবে নিশ্চই।

বাড়ি এসে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া সারলাম। রাতে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ মোবাইল দেখা আমার স্বভাব। ফেসবুক অন করতেই ইনবক্সে কিছু মেসেজ নোটিফিকেশন পেলাম। খুলতেই দ্বিতীয় নাম্বারে পল্লবের মেসেজ দেখলাম। ইনবক্স ওপেন করতেই আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল। ওর লেখা মেসেজ এর বয়ানটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

"দেবুদা মানে দেমামাল্যদার কথা বলছিস তো? তুই জানিস না খবরটা? আসলে সে এক প্যাথেটিক ঘটনা। আগের বার কালী পুজোর সময় গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন দেবুদা। কালী পুজোর পরদিন কোনো একটা কাজে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু সেই রাতে আর বাড়ি ফেরেননি মানুষটা। পরদিন ওনার মৃতেদেহ পাওয়া যায় ওনার বাড়ির কাছেই, ওনার কাকার ঘরের সামনে। ময়নতদন্তের রিপোর্ট

আসলে জানা যায়, হার্ট অ্যাটাক হবার কারণে মৃত্যু। খুব খারাপ লাগছিলো খবরটা শুনে। জানিস স্বর্ণা, কদিন পরই দেবুদার বিয়ে ছিলো। সব শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু কি ভাবে যে মারা গেলেন, কোনো কারণই জানা যায়নি আজ পর্যন্ত।”

বিশ্বাস করুন, সেদিন সন্ধ্যার ব্যাখ্যাটা আজও আমার কাছে নেই... ■

দীপাবলি

প্রদীপসজ্জাঃ চন্দ্রিমা বোস দত্ত (হাওড়া)
চিত্রগ্রহণঃ গৌতম বোস (হাওড়া)

দীপাবলির ভূমিচিত্রঃ অলকা চৌগুলে (মুম্বাই)
চিত্রগ্রহণঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (মুম্বাই)

অভিশাপ

রিয়া মিত্র

পুং ভ্যালির পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে হিসেব করছিলাম, আজকের উপরি উপার্জন কত হলো? রাতে ইয়ার-দোস্তদের সাথে পানের টাকা রেখে বাকিটা আলাদা সরিয়ে রাখলাম। গায়ের জ্যাকেটটা আরেকটু ভালো করে টেনে ফীল করলাম, আজ প্রায় - ২°সে. ঠাণ্ডা হবে। এত ঠাণ্ডায় শরীর একটু গরম না করলে হয় না।

গল্পের শুরুতেই আমার পরিচয় দিই। আমার নাম বিনয়, শিলিগুড়িতে থাকি। ছোটবেলা থেকে একদমই পড়াশোনা করতাম না। যত বাজে দিকে আমার মন ছিল। ঐ বখাটে ছেলে বলতে যা বোঝায়, আর কী? শেষে পড়াশোনা হবে না দেখে বাবা একটা সুইফট্ ডিজায়ার গাড়ি কিনে দেয়। সেই থেকে গাড়ির বিজনেসই করি। আশেপাশের বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি নিয়ে ট্রিপ করি। এ'বারে এলাম ভুটান। এর আগেও অনেক প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে ভুটানে এসেছি। এই জায়গাগুলো প্রায় আমার নখদর্পণে। যতগুলো জায়গায় গেছি, তার মধ্যে ভুটান আমার সবথেকে প্রিয় জায়গা। যেমন সুন্দর এখানকার আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্য, তেমনই সুন্দর এখানকার মেয়েরা। বন্ধু-বান্ধবের দৌলতে পান শেষ

হওয়ার পর প্রায় প্রতি রাতে নারীসঙ্গ পেতে আমার কোনো অসুবিধে হয় না।

এবারে যাদেরকে নিয়ে ট্রিপে এসেছি, তারা প্রবাসী বাঙালী পরিবার। বহুদিন হলো ওনারা ইন্ডিয়া ছেড়ে লন্ডনে থাকতে শুরু করেছেন। স্বামী, স্ত্রী আর ওনাদের বছর কুড়ির একটি মেয়ে। ভুটানের টাইগার নেস্টে ওঠার মানত ছিল, সেটা পূর্ণ করে, বাকি কয়েকদিন তাঁরা আমার সাথে ভুটান শহরটা ঘুরে দেখবেন। এইজন্য ভুটান শহরটা আমার বেশি ভালো লাগে যে, এখানে প্রচুর বিদেশি মেয়েরা ঘুরতে আসে। তাদের দেখেও আমার মনটা একটু শান্ত হয়। এই আমার একটা দুর্বলতা। বাবা আমার এই স্বভাব বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি আমার বিয়েও দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তো শুধরনেওয়ালা বান্দা নই। ঘরে বৌ থাকতেও বাইরের মেয়েরাই আমার কাছে বেশি ভালো লাগে। বৌ বুঝতে পেরে আমার সাথে অশান্তি করত খুব। বৌকে আমিই তাই লা-পাতা করে দিয়েছি, কেউ ওর খোঁজ পাবে না।

আজকে আর বেশি পান করলাম না। কাল ভোরে উঠে বেরোতে হবে। অনেকগুলো স্পট কাল ওনাদের দেখাতে হবে। হোটেলের রুমে শুয়ে জানালা দিয়ে দূরের সারি সারি অন্ধকার পাহাড়গুলোকে দেখতে দেখতে চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো।

ভোরবেলা বেরিয়ে দেখলাম, রাতে বেশ বরফ পড়েছে।

প্রতিশোধ

সামান্য ব্রেকফাস্ট করে, ট্রিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চেলালা পাসের পাশ দিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে গাড়ি চালাচ্ছি। এরপর আর দুটো জং বা বৌদ্ধ-মন্দির ওদের দেখিয়ে শেষে যাব 'কুচু লাখাং ফোর্ট।' বিকেল পাঁচটার মধ্যে এই ফোর্টটি ঘোরা শেষ করতে হবে। সেইজন্যই আজ ভোরবেলায় বেরিয়েছি। সকলে বলে, এই ফোর্টটিতে সন্ধ্যে নামলেই অশরীরীদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। যদিও আমি ওসব বোগাস কথা মানি না, তবুও প্যাসেঞ্জারকে সাবধানে রাখা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

গাড়ি চালাতে চালাতেই সকলের সাথে কথা হচ্ছিল। কৌশিকবাবু, তাঁর স্ত্রী প্রভাদেবী ও তাঁর মেয়ে ন্যান্সি সকলেই খুব মিশুকে। আমি মাঝে মাঝেই লুকিং-গ্লাসে ন্যান্সিকে দেখে নিচ্ছিলাম। আমার মনে হলো, নীল চোখের ন্যান্সিও যেন দূরের পাইনের সারি আর আপেল বাগান দেখতে দেখতে আড়চোখে আমার দিকেই তাকাচ্ছে। বিদেশের মেয়ে তো, এখানকার মেয়েদের মতো অত লাজ-লজ্জা-শরমের ধার ধারে না।

রিংপুং জং পৌঁছে সকলে যখন হাঁটছি, ন্যান্সি যেন আমার পাশে একটু বেশি ঘেঁষে হাঁটছে। মনটা খুশ লাগছে। বিদেশিনী যখন নিজে যেচেই আমাকে আহ্বান করছে, তখন আমি সাড়া না দিয়ে থাকি কী করে? ন্যান্সিকে একান্তে কাছে পাওয়ার সুযোগই পাচ্ছিলাম না। মনে মনে ছক কষে

দেখলাম, ফোর্টের বিশাল বড় ভুলভুলাইয়া পথে অনেক গোপন জায়গা আছে, যেগুলো আমরা চিনি কিন্তু পর্যটকরা ততটা ঘুরে দেখে না। স্বাভাবিকভাবেই এত বড় ফোর্টের সমস্ত কোণা দেখা সম্ভব নয়, মেইন কয়েকটি পয়েন্ট দেখেই তারা খুশি। ঐখানেই ন্যান্সির সাথে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়া যাবে, আশা করি।

দুপুর আড়াইটে নাগাদ আমরা কুচু লাখাং ফোর্টে পৌঁছালাম। আজকে অন্যান্য পর্যটকদেরও বেশ কম আগমন হয়েছে দেখে আমি মনে মনে খুব খুশি হলাম। কৌশিক বাবুরা গাইডের সাহায্যে ফোর্টের ইতিহাস শুনছেন। একটা সময়ে মায়ানমারের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় অসংখ্য সেনাকে এই ফোর্টের মধ্যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় আর মনে করা হয়, এখনও সেই অতৃপ্ত আত্মারা এই দুর্গের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায় আর সন্ধ্যে হলেই আর্তনাদ করতে থাকে।

ওনারা সকলেই ইতিহাস শোনায় ব্যস্ত থাকায় সবার অলক্ষ্যে আমি ন্যান্সির হাত ধরে দুর্গের তিনতলায় নিয়ে এলাম। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় ন্যান্সি বলল, “এখানে বুঝি কেউ আসে না?” আমি ন্যান্সির আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বললাম, “এখানে শুধু তুমি আর আমি। বাকিরা এখানে আসবে না।” তিনতলার চাতালের পাশের সুড়ঙ্গে আমি ন্যান্সিকে নিয়ে আসলাম। দুর্গের ঘুলঘুলির ফোকর দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ল ন্যান্সির মুখে। ন্যান্সি নিজে থেকেই আমাকে জড়িয়ে

ধরল। ওর নীল চোখের মধ্যে একটা কী যেন টান ছিল... কিন্তু এ কী! ও আস্তে আস্তে এত জোরে চেপে ধরছে কেন আমাকে! আমি ঝটকা মেরে ওকে ছাড়াতে গেলাম কিন্তু দুটো সাঁড়াশির মতো ঠাণ্ডা হাত যেন আমাকে চেপে ধরে রেখেছে। ন্যান্সি তখনও আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। এ কী! ওর চোখের মণি তো নীল ছিল, হঠাৎ কালো কীভাবে হয়ে গেল! ন্যান্সির মুখটা ক্রমশ পাল্টে যেতে লাগলো, মুখের মাংসগুলো খুলে ঝুলে পড়তে লাগলো, চোখগুলো কোটরে ঢুকে গেছে, ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে রস গড়িয়ে পড়ছে। আমি আতঙ্কে চিৎকার করতে গেলাম কিন্তু পারলাম না। গলা দিয়ে মিনমিন করে আওয়াজ বেরিয়ে এলো, "এ কী শারোন, তুমি!... তুমি কীভাবে এইখানে এলে?" শারোন রূপী ন্যান্সি বিকট স্বরে হেসে বলল, "চিনতে পেরেছিস আমাকে, শয়তান? মনে আছে আমাকে?" আমি কাকুতি-মিনতি করে বললাম, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আর করব না।" ন্যান্সি বিকট হেসে বলল, "তোকে আর করতে দিলে তো? কী দোষ করেছিলাম আমি যে তুই আমাকে মেরে তোরই বাড়ির বাগানে পুঁতে দিলি? এতটা নৃশংস মানুষ কী করে হয়? তোর সাথে তো আমি সংসার করতে চেয়েছিলাম। স্বামী হয়ে নিজের স্ত্রীকে এত নৃশংসভাবে খুন করতে পারলি তুই?" আমি হাত জোর করে বললাম, "আমাকে ক্ষমা করে দাও।" আমার গলায়

শারোনের লম্বা ঠাণ্ডা হাতগুলো চেপে বসতে লাগলো আর কানে ভেসে আসতে লাগলো ওর কণ্ঠস্বর, "দুর্গের অশরীরী, অতৃপ্ত আত্মাদের সাথে তুইও এই দুর্গেই অতৃপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবি এবার থেকে..."

এদিকে কৌশিকবাবু, প্রভাদেবী, আসল ন্যান্সি দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তিত মুখে আমাকে ফোন করেই যাচ্ছেন। এমন সময়ে তিনতলা থেকে ঝপ্ করে ওদের পায়ের কাছে আমার লাশটা পড়ল। সকলেই চমকে গিয়ে দিশেহারা হয়ে উঠলো। সকলে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। গাইড সকলকে নির্দেশ দিলেন, "সন্ধ্যে হয়ে আসছে, অশরীরীদের উৎপাত শুরু হয়ে গেছে, এখান থেকে দ্রুত পালানো ছাড়া আর উপায় নেই।" সকলে দৌড়ে দুর্গের সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেল শুধু শারোনের অভিশাপে দুর্গের অতৃপ্ত আত্মাদের সাথে আমি, অভিশপ্ত এক আত্মা আজও এই দুর্গের মধ্যে হাহাকার করে বেড়াই... ■

রক্ষাকর্তা

সমীর দাস

ট থেকেই ভক্ত ভূতের গল্প পড়ার...
ভাবতাম, ছোট কর্তার মতো করব ভূত
শিকার...

অবশেষে এসেছিল সেই অশুভ ও শুভ ক্ষণ,
পেত্নীর দর্শন বা তাড়ন, সাথে ভূতের ফিরিয়ে দেওয়া
জীবনধন।

গভীর রাত, বাড়ি ফিরছি চেনা রাস্তা ধরে,
কুয়াশা নেমেছে, সব কিছু ঝাপসা অদূরে-সুদূরে।

গাড়ি চালাই সাবধানে, ধীরে ধীরে
হঠাৎ দেখি, সামনে কে যেন ইশারা করে...

নারী মূর্তি, জিন্স আর কুর্তি
এসে পড়ে সামনে, মুখে করুণ আর্তি –

দিন-কাল ভাল নয়, স্বার্থপর হই, থামি না তাই
এড়িয়ে, এগিয়ে যাই।

যেন হল মনে,
সে দৌড়য় পেছনে পেছনে...

প্রেতচ্ছায়া

ততক্ষনে পড়েছে মনে, তাই অন্ধকারে অন্ধের মত পালাই,
কিন্তু চেনা রাস্তা দিয়ে এ কোথায় পৌঁছাই!

সামনে পীরের প্রাচীন দরগা, চেনা জায়গা,
পীর বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, যেন আমারই প্রতীক্ষায় এখনো
জাগা...

যাই দরগায়, চাই আশ্রয়, পীর বাবা অভয় দেন
সঙ্গে চলে, বাড়ী পৌঁছে দেন।
তারপর হেঁটে হেঁটে ফিরে যান,
আমি দেখি, কুয়াশায় মিশে যান...

পড়েছিলাম বটে, অনেকের সঙ্গেই এ ঘটনা ঘটে
এমনি কোন রাতে, মরেছিল অভাগিনী গাড়ি চাপাতে
পারেনি পৌঁছতে বাড়ীতে,
আজও চেষ্টায় থাকে সে ঘরে ফিরতে।

সত্যি ঘটনা, ঘটে দিল্লী ক্যান্টনমেন্টে,
পেয়ে যাবে, খবরের কাগজে, ইন্টারনেটে...

পরের দিন যাই পীরের দরগাতে,
শুনি সে পীরবাবা ক'দিন আগে, ঘুমোতে চলে গেছেন
কবরেতে...
এসেছিলেন উঠে, আমাকে বাঁচাতে
জীবনে এমন অনেক ঘটেছে বটে, জানাব সময়েতে। ■

দানুবিবি

অমিত সাহা

আজ পাঁচ বছর হলো, রজত ও মুনের বিয়ের। কিন্তু এখনো ওরা দুজনই রয়ে গেছে। হাজার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। দুজনের জীবনেই একটা অগাধ শূণ্যতা! তবুও একে অন্যকে সামলে রাখে। রজত ভালো চাকরি করে, উপার্জন প্রচুর। ইতিমধ্যে সুযোগ পেলেই এদিকে-ওদিকে বেরিয়ে আসে ওরা, এমনকি দেশের বাইরেও। গত বছর পুজোর ছুটিতে আগে থেকে আর টিকিট কাটতে পারেনি, তাই ইচ্ছে থাকলেও সেবারের মতো ওদের আর আন্দামান যাওয়া হয়ে উঠলো না। এদিকে মুনের সমুদ্র দেখার খুব ইচ্ছে। রজত মুনের কোনো ইচ্ছে সাধারণত অপূর্ণ রাখে না, চেষ্টা করে মেটাতে। তাই অগত্যা দুজন মিলে ঠিক করল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই কোনো নিরালা সমুদ্র সৈকতে কাটিয়ে আসবে কটা দিন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা আনকোরা জায়গা বের করলো ওরা দুজন। লক্ষ্মীপুজো মিটে যাবার দুদিন পর ওরা রওনা দিল, গন্তব্য চিলখালি।

শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ট্রেন ধরে পূর্বনির্ধারিত স্টেশনে নেমে ট্রলি করে নদীর পার, নৌকায় নদী পেরিয়ে বাসে

করে ঘন্টাখানেক যাবার পর ওরা যখন চিলখালি পৌঁছল তখন গাঢ় সন্ধ্যে।

রজত আর মুনের আগে থেকে হোটেল বুক করা ছিল না। বাস থেকে নেমে ওরা হোটেল বুকিংএর জন্য খোঁজ করতে শুরু করলো। তখন অফ সিজন। অনেক হোটেলই ফাঁকা এবং যথারীতি ভাড়াও কম। অনেক বিলাসবহুল হোটেলও খুব কম রেন্ট, কিন্তু একটা ভীষণ ফাঁকা আর গা ছমছমে ভাব... তাই অনেক হোটেল দেখার পরও কোনোটাতেই ওদের থাকতে ঠিক পছন্দ হলো না। এদিকে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাতের দিকে এগোচ্ছে। খিদে আর ক্লান্তিতে শরীর যেন ওদের আর চলছে না। হঠাৎ মুনের চোখে পড়ল একটা হোটেল। বারান্দায় বেশ কিছু জামাকাপড় মেলা। ওরা বুঝতে পারলো, ঐ হোটেলটাতে বেশ কিছু মানুষ আছে। আর এক মুহুর্ত দেরী না করে ওরা ঐ হোটেলের দিকে পা বাড়াল।

ঠিকই, এখানে বেশ কিছু মানুষ আছে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো ওরা। একটা ভালো রুমও পেয়ে গেলো। রুম বুক করে রুমে গিয়ে ফ্রেশ হলো। তারপর নীচে নেমে বাইরে খেতে যাবে, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে হাজির। হোটেলের কেয়ারটেকার জানালো যে ঐ ভদ্রলোক একজন টোটোচালক। যদি আশেপাশের বিভিন্ন জায়গা ওরা ঘুরে দেখতে চায়, তাহলে উনি কাল সকাল সকাল চলে

আসবেন। কৌতূহলবশত মুন জিজ্ঞেস করল, “এখানে সমুদ্র বাদ দিয়ে দেখার আর কি কি জায়গা আছে?”

ভদ্রলোকটি বেশ কিছু জায়গার নাম বললেন। ওদের শুনে বেশ আগ্রহ জাগলো। তারপর তিনি বললেন, “আর একটা জায়গাও আছে, তবে...” এই বলে উনি থেমে গেলেন। যাবার আগে ওনার ফোন নং রজত রেখে দিলো, জানালো গেলে পড়ে রাতের মধ্যে ফোনে জানিয়ে দেবে। লোকটি যাবার আগে জানালেন ওনার গাড়িভাড়া ৩০০ টাকা লাগবে।

এরপর ওরা বাইরে বেরোলো। জায়গাটা বেশ ভালোই, কিন্তু বড্ড বেশি নির্জন। এতটা নির্জনতা ওরা আশা করেনি। যাই হোক একটা চায়ের দোকানে ঢুকলো ওরা দুজন। চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে এক লোকের সাথে আলাপ জমলো। রজত আবার অচেনা মানুষের সঙ্গে নিমেষেই আলাপ জমাতে খুব ওস্তাদ।

লোকটার সাথে কথা বলতে বলতে এলাকার অনেক জায়গার খোঁজখবরই ওরা পেল। গরম চায়ের কাপে আড্ডাটা বেশ ভালোই জমে উঠেছে। ঠিক হলো উনি ওদের কাল বিভিন্ন জায়গা ঘুরিয়ে দেখাবেন ওনার টোটোতে, ২০০/- নেবেন। কিন্তু কোনোমতেই একটা জায়গায় ওদের নিয়ে যেতে পারবেন না। যাই হোক, রজত আর মুন রাজি হয়ে গেলো। চা খেয়ে ওরা বিচে গেলো। সমুদ্রের যে এতো নির্জনতা আছে, তা মুনের আগে জানতোই না! একটা অদ্ভুত

আশীর্বাদ

ঠান্ডা হাওয়া আর তার সাথে রজতের ছুঁয়ে থাকা হাতের উষ্ণতা, এই দুই মিলে একটা দারুণ অনুভূতি আজ মুনের সারা শরীর মন জুড়ে। এদিকে নাকে ভেসে আসছে বিভিন্ন মাছ ভাজার গন্ধ! ওরা গিয়ে আমোদি মাছ ভাজা অর্ডার দিলো। দারুণ লাগছে খেতে! গলদা চিংড়িরকারী অর্ডার দিয়ে বানিয়ে খাওয়ার হোটেলে গরম ভাতের সাথে তাও খেলো। তারপর হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সারাদিনের ক্লান্তিতে তাড়াতাড়ি ঘুম এসে গেলো ওদের। কিন্তু হঠাৎ ঘুমের মধ্যে মুন প্রচন্ড চিৎকার করে কিছু না বলেই রজতকে আঁকড়ে ধরলো! রজত অনেকবার মুনকে জাগানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু মুন উঠলো না। ও রজতকে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে শুয়ে থাকলো।

পরের দিন সকাল সকালই টোটো নিয়ে লোকটা ওদের হোটেলের সামনে হাজির হলো। ইতিমধ্যেই মুন ও রজত ফ্রেশ হয়ে তৈরি। দুজনে আশপাশের বেশ কিছু এলাকা ঘুরে দেখলো; জেমস আইল্যান্ড, টিজারগঞ্জ আরও অনেক জায়গা। এলাকাগুলোয় প্রধানত মৎস্যজীবীদের বসবাস। মাছের ওপর নির্ভর করেই ওদের পেট চলে। ঘুরতে ঘুরতে রাস্তায় ওরা টিফিন করে নিলো। হোটেলে যখন ফিরলো তখন প্রায় বারোটা। হোটেলে এসে একটু বিশ্রাম করে ওরা সমুদ্রের দিকে গেলো স্নানের জন্য। রোদের ভীষণ তেজ। পায়ের নীচে গরম বালি, মাথার ওপর কাঠফাটা রোদ। বিচে

আশীর্বাদ

যত এগোচ্ছে তত বেশি গরম বাড়ছে। রজত হঠাৎ খেয়াল করলো মুন কেমন যেন আপনমনে বিচ ধরে উত্তরদিকে হেঁটে চলেছে। রজত ব্যাপারটাকে প্রথমে হালকাভাবে নিলো। কিন্তু হঠাৎই মুনের হাঁটার বেগ বাড়ায় রজতের কাছে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগতে শুরু করলো। সে মুনকে থামানোর হাজারো চেষ্টা করলেও পারলো না। মুন এবার ছুটতে শুরু করলো। মুনের পিছনে ছুটতে ছুটতে রজত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে কিন্তু মুনের কোনো ক্লান্তি নেই! এভাবে ছুটতে ছুটতে ওরা কখন যে গভীর ঝাউবনে ঢুকে গেছে, তা আর বুঝতে পারেনি।

গভীর অন্ধকার ঝাউবন, গায়ে কাঁটা দেবার মতো নিস্তব্ধতা। বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর মুন দাঁড়িয়ে পড়ল। রজতও থামলো। সামনে একটা ভাঙাচোরা মন্দির। কিন্তু কেউ কোথাও নেই! ঐ অন্ধকার ভেদ করে এক চিলতে সূর্যের আলো মন্দিরের ভেতরে থাকা অস্পষ্ট মূর্তিটার ওপরে পড়েছে। এ মূর্তি রজত আগে কখনো দেখেনি, ভয়ঙ্কর এক মূর্তি! মুনের চোখে মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি, যেন মূর্তিটা ও আগেও দেখেছে; কিন্তু কোথায় তা আর মুন মনে করতে পারছে না... যাই হোক, মুন আর রজত দেখল ঐ মন্দিরের ভেতর থেকে একটা বাচ্চা বেরিয়ে আসলো। এই গভীর জঙ্গলে বাচ্চাটিকে দেখে ওরা বাচ্চাটিকে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি এখানে একা একা কি করছো?"

আশীর্বাদ

বাচ্চাটি বলল, “আমি তো এখানেই থাকি।”

মুন বলল, “তোমার একা একা থাকতে ভয় করে না? কি নাম তোমার?”

বাচ্চাটি জানালো, “দূর! ভয় কিসের গো? নিজের বাড়িতে থাকতে কেউ ভয় পায়? আমি তো দানু, আমাকে এখানে সবাই চেনে।” মুন বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল, অনেক আদর করল। রজতও প্রচুর ভালোবাসল দানুকে। এমন সময় দানু বলে উঠলো, “আমাকে একটু কোল থেকে নামাও না মা!”

মুনের মনটা বিষাদে আনন্দে ভরে উঠলো! এত বছরের মধ্যে এই প্রথম মুন ‘মা’ ডাক শুনলো। এ এক অপার প্রাপ্তি! যাই হোক, মুন কোল থেকে দানুকে নামিয়ে দিতেই দানু এক ছুটে মন্দিরের ভেতরের মূর্তিটার সামনে থেকে একটু প্রসাদ আর জল এনে মুনের হাতে দিয়ে বলল, “এই নাও, এটুকু খেয়ে নাও। এতটা পথ তোমরা এসেছো!” মুন আর রজতের সত্যি সত্যিই খুব তেষ্টা পেয়েছিল, ওরা খেল। দানু মুচকি মুচকি হাসছে। তারপর দানু জলের খালি পাত্রটা নিয়ে মন্দিরের ভেতরে ঢুকলো। ওরা দুজন বাইরে বসে থাকলো।

এদিকে দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে এলো, দানু আর মন্দির থেকে বেরোলো না! অন্ধকার আরো গাঢ় হচ্ছে। রজত আর এখানে অপেক্ষা করতে রাজি হলো না। বাধ্য হয়েই মুন রজতের সাথে ফিরে এলো। ওরা যখন হোটেলে

পৌঁছল তখন সন্ধ্যে।

সমুদ্রস্নান ওদের আর হলো না। সন্ধ্যার পর বেরিয়ে বাইরে কোনোরকমে ফাস্টফুড দিয়েই ডিনার করল। রাতে একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো রজত আর মুন। কিছুতেই ঘুম আসছে না! দুজনেরই দানুর কথা খুব মনে পড়ছে। এমন সময় হঠাৎ মুন রজতের বুকের মধ্যে মাথা দিয়ে প্রচন্ড কাঁদতে শুরু করলো। রজত মুনকে অনেক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু লাভ হলো না! এক সময় রজত আর মুন দুজনেই ভাসতে শুরু করলো নিখাদ ভালোবাসার স্রোতে। অনেক দিন পর আজ দুজনেই পরিতৃপ্ত। এক সময় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে রজত একটু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। এমন সময় হোটেলের কেয়ারটেকারের সাথে দেখা। রজত ওনাকে ঘটনাচক্রে দানুর কথাটা বলতেই উনি অবাক হয়ে গেলেন! উনি বললেন, "আমরা শুনেছিলাম ঐ ঘন জঙ্গলে একটি মূর্তি আছে। আমরা সাধারণত ঐদিকে কেউই যাইনা। ওখানে একটা বাচ্চার পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যেত, তাও সে বহু বছর আগে। শোনা যায় কেউ বা কারা এসে একটা সদ্যোজাত বাচ্চাকে ঐ জঙ্গলে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।"

রজতের শরীর যেন ঠান্ডা হয়ে আসছে। উনি আরও বললেন, "আমরা ঐ জঙ্গলটাকে দানুবিবির জঙ্গল বলে থাকি। তবে ঐ ভয়ঙ্কর জঙ্গল থেকে আপনারা দুজন কিভাবে যে

বেঁচে ফিরে এলেন তা একমাত্র ওপরওয়ালাই জানেন!”

যাই হোক, রজত ঘরে ফিরে এলো। মুন সবে ঘুম থেকে উঠেছে। রজতকে কাছে বসিয়ে মুন বললো, “জানো? সেদিন যখন ঘুমের মধ্যে আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম তখন যে ভয়ঙ্কর মূর্তিটা দেখেছিলাম, তার সাথে ঐ জঙ্গলের মূর্তিটার অদ্ভুত মিল!” রজত তখন কেয়ারটেকারের কাছ থেকে শোনা গোটা ঘটনাটি মুনকে বললো। মুন শুনে অবাক হয়ে গেলো। ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করে ওরা হোটেল থেকে বেরিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল। বাড়ি ফিরতে প্রায় রাত হয়ে গেলো। পরের দিন থেকে আবার দৈনন্দিন জীবনে ফিরে আসতে হলো। এমন করে মাসখানেক ঠিকঠাকই যাচ্ছিলো। তারপর হঠাৎ মুনের শরীরটা খুব খারাপ করতে লাগলো। রজত আর একমুহূর্ত দেরি না করে ডাক্তার ডেকে আনলো। ডাক্তার এসে মুনকে খুব ভালো করে দেখলেন। তারপর মুনকে বললেন, “এতোদিনে তোমাদের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে, ছোট্ট নতুন অতিথি আসছে তোমাদের বাড়িতে।”

মুন আর রজত একে অপরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। দুজনেই বাকরুদ্ধ। ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর মুন রজতকে জিজ্ঞাসা করল, “আমরা ওর নাম তাহলে কি রাখবো? দানু তো?” ■

(ওপরের গল্পটা পুরোটাই মনোরঞ্জনের জন্য লেখা। এর সাথে বাস্তব জীবনের কোনো মিল কেউ খুঁজে পেলে, তার জন্য লেখক কোনোভাবেই দায়বদ্ধ নন।)

মূর্তি

অনির্বাণ বিশ্বাস

নাম তাঁর জনার্দন বারিক। নামকরা সাহিত্যিক ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর মূর্তিটা বসেছিলো ঠিক পাড়ার চৌরাস্তার মোড়ে। মূর্তির উদ্বোধনের দিন প্রচুর লোকসমাগম হয়েছিলো। পাড়ার কাউন্সিলার, বিধায়ক ও কয়েকজন সাহিত্যিককেও ডাকা হয়েছিলো। মূর্তিতে মাল্যদান করে, বিধায়ক দাদা ইন্টেলেচুয়াল বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সমস্যাটা হয়েছিলো, শুরুতে বিধায়ক দাদা তাঁর আসল নামটা ভুলে গিয়েছিলেন। অবশ্য তাতে খুব একটা সমস্যা হয়নি, কারণ পিছন থেকে কেউ নামটা বলে দিয়েছিলো। শুনতে একটু গোলমাল হওয়ায় তিনি পদবিটা বারিক না বলে দু'বার বালি বলে ফেলেন। সেটাও পাশ থেকে কেউ সংশোধন করে দেয়। এতেও ঠিক ওনাকে দোষ দেওয়া যায়না। কারণ বালির ব্যবসা থেকেই প্রমোটারি, আর সেখান থেকেই তাঁর এই উত্থান। বক্তৃতার মাঝেই তিনি এটাও শুনিয়ে দেন যে ওনার কাছেই একটা ফ্ল্যাটের জন্য এসে এই বারিক বাবু কিনতে না পেড়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। তারপর গুণী মানুষ দেখে ওনার করুণা হওয়ায়, উনি

পরিণতি

ওনাকে টাকাটা না কমিয়ে শোধ করার জন্য প্রচুর সময় দিয়েছিলেন। এরপর বলাই বাহুল্য – প্রচুর হাততালি পড়েছিলো। স্তাবকবৃন্দ একেবারে গদগদ। উনি তারপর নিজের প্রসঙ্গে চলে গেছিলেন। পড়াশুনো না করেও কিভাবে তিনি নেতা হয়েছেন। এখন তিনি কোন ইস্কুলে কত ডোনেশন দিয়েছেন ইত্যাদি। ক্ষণে ক্ষণে করতালিতে ওনার ছেলেরা সভাস্থল ভরিয়ে তুলছিলো। পরপর অন্য নেতৃত্ব ও প্রচুর ভালো ভালো উচ্চস্তরের কথা বলেছিলেন।

তারপর পাড়ার ডাকসাইটে নেতা মঞ্চে এসে, বারিক বাবু তাঁর কতো কাছের লোক ছিলেন তা বলতে বলতে আবেগ বিহ্বল হয়ে বারিক বাবুর কন্যার দিকে বিশেষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে দুর্বলতা বোঝাতে চাইছিলেন। তবে বারিকবাবুর স্ত্রী না তাঁর কন্যা – কার উপর যে বেশী দুর্বলতা সেটা ঠিক বোঝা না গেলেও পাবলিক সেন্টিমেন্ট দারুণ তৈরী হয়েছিলো।

সভাস্থলে বারিক বাবুর স্ত্রী ও কন্যা ছলছল চোখে বসেছিলেন। যাই হোক শেষ বক্তৃতার সময়ে পাড়ার কাউন্সিলার মনে হয় একটু বেশীই আবেগাপ্লুত হয়ে গেছিলেন। কারণ তিনি বারিক বাবুর লেখাকে রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য – বা কিছুক্ষেত্রে যে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও ছাপিয়ে গেছেন – এই কথা বলে বসলেন। এতে সভার অন্য কারোর কিছু হয়েছিলো কিনা কে জানে, ওনার স্ত্রীও

সাময়িক দুঃখ ভুলে চমকে উঠলেন। যাই হোক নিজেকে তিনি পরে সামলে নিয়েছিলেন।

তারপর পাড়ার দাদারা একটু গান-বাজনারও বন্দোবস্ত করেছিলেন। কয়েকটা টিভি চ্যানেলের লোকও এসেছিলেন। অনুষ্ঠান একেবারে জমজমাট। অনুষ্ঠান শেষে বারিকবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় বিধায়ক একটু আমতাআমতা করে বলেছিলেন, "শুনেছি এলাকার ছেলেদের সঙ্গে চাঁদা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিলো। বাচ্ছারা হয়তো একটু উত্তেজনার বশে ওনাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলো। কিন্তু তাতে দাদা এভাবে চলে যাবেন ওরা ঠিক বুঝতে পারেনি। হাইপ্রেশারের রুগী তো এরকম উত্তেজিত ওনার হওয়া উচিত হয়নি। আমি শুনে খুব বকেছি। একি! এতো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে এরকম ব্যবহার! তবে দেখুন ওদের মন কতো বড়ো! মার্বেলের মূর্তি করে দিয়ে পুরো অনুষ্ঠানটা ওরাই যা করবার করেছে।"

পাড়ার ছেলেরা এসে বললো, "বউদি, যা হবার হয়ে গেছে, ভুলে যান। দেখুন দাদার মূর্তির উপর ঢাকনা দিয়ে দিয়েছি। হুম্, যাতে কাকে পটি-টটি না করে।" তারপর বিধায়ক দাদার দিকে তাকিয়ে কেতা মেরে ভারিক্কি চালে বললো, "জানো দাদা, ওই শালাটা মাথায় ঢাকনা দেবেনা বলেছিলো। আমি দিয়েছি কানচাপাটি। ব্যাস্, রাজি। এরপর বউদি, ওপরে সাইডে দুটো-চারটে লাইট লাগিয়ে দেবো।

রাত্রে যা জকাশ্ লাগবেনা দাদাকে, দেখবেন। আর আমাদের এই দাদা বলে দিয়েছেন, এবার যখন যা কিছু অসুবিধা হবে একবার লাল্টু বলে ডাক দেবেন ব্যাস্। ঠিক আছে, আসছি বউদি। কই মামুনি, আসছি। এসো দাদা, চলো তোমাকে গাড়ীতে তুলে দি।"

সব নেতারা চলে গেলে, বারিকবাবুর স্ত্রী-কন্যা একবার মূর্তিটাকে প্রণাম করে চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেলেন। বারিকবাবুর মেয়ে তীব্র ঘৃণায় বলে উঠলো, "যত সব শয়তান গুণ্ডা..."

মেয়ের মুখটা চেপে ধরে ওনার স্ত্রী, "চুপ কর"- বলে চলে গেছিলেন। সন্ধ্যেবেলা পাড়ার ছেলেরা সত্যিই লাইট লাগিয়ে দিয়েছিলো। সবাই তারপর সব ধরনের গান বাজিয়ে পাড়ার ছেলেরা খুব হই-হুল্লোড় করে শেষে ক্লাব ঘরে ঢুকে আ-রো আনন্দ করার প্রস্তুতি নিয়েছিলো।

সেদিন খুবই গরম ছিলো। একটু রাতে সব ফাঁকা হয়ে গেলে, একজন বয়স্ক, টাক মাথা লোক চারিদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে মূর্তিটার সামনে এসে দাঁড়ালো। কেমন যেন একটু ইতস্তত ভাব ছিলো। সে আস্তে আস্তে মূর্তিটার একদম কাছে গিয়ে, কিছক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো। গলা খুব নামিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলেছিলো, "ভাইরে, তোকে কতো হিংসে করেছি, কতো তোদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি। আমাদের

জন্যই তোকে বাড়ি ছাড়তে হয়। আমার অপরাধের কোনো সীমা নেই রে। তুই চলে গেলি আমি তোকে শেষের দেখা অবধি দেখতে যাইনি। ভাই রে, তুই যেখানেই থাকিস আমায় ক্ষমা করিস!”

সেদিন তার এই বুক ফাটা কান্না শোনার জন্য কয়েকটা কুকুর ছাড়া কেউ ছিলো না। সময়ের কাজ অসময়ে করে জীবনে কোনো লাভই হয়না। অথচ আমরা আত্মগরীমায় এতটুকু নম্য হতে পারিনা। একজন এক হাত বাড়ালে অপরজনের অভিমানের জমাট বরফ যে গলতে পারে, সেটা জেনেও কে প্রথম নত হবে এই অভিমানেই কতো বড়ো বড়ো গভীর সম্পর্ক যে ভেঙে যায়, তার কোনো হিসাব নেই। বারিকবাবুর দাদার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। রাতের অন্ধকারে তাঁর আত্মগ্লানি কেই বা শুনবে? আর তাতে এখন কি-ই বা লাভ? তিনি অঝোরে কাঁদছিলেন।

হঠাৎ যেন কেউ তাঁর কানের কাছে বলে উঠলো, “সেই এলি, একটু আগে আসতে পারলিনা দাদা?” তিনি চমকে উঠে চারিদিকে চেয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে শেষে মূর্তির দিকে ধীরে ধীরে তাকালেন। তাঁর সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো... ■

কালি-শক-লিং

দোলা ভট্টাচার্য

পুজোয় গেলাম বেড়াতে,
সবুজ পাহাড় ডাক পাঠাল
পারলাম না এড়াতে।
চেপে বসলাম রেলগাড়িতে
চলে এলাম কালিংপঙ।
বন পাহাড়ের রাজ্যে আমার হারিয়ে গেল অবুঝ মন।
ঘুরে নিয়ে কালিংপঙ, এলাম চলে পেশকে,
পাহাড় ঘেরা ছোট্ট সে দেশ
মোড়া সবুজ পোষাকে।
ছবির মতো বাংলো বাড়ি,
এই খানেতেই বাসা গাড়ি,
ভূত বাংলোর খ্যাতি শুনে দেখতে এলাম পেশকে।
ঘুরবো কদিন থাকবো দুদিন, খুঁজবো ভূতের বাসাকে।
রাত বিরেতে শেয়াল ডাকে হুক্কা হুয়া হুয়া রে,
বাতির আলোয় দেওয়ালগুলোয়
দেখি কাদের ছায়া রে!
ছায়াগুলো নাচতে থাকে
ভূতগুলো সব হাসতে থাকে
খিঁ খিঁ খিঁ খিঁকির খিঁকির খিরির খিরির খির করে,

ভয়

ভূতের হাসির শব্দ শুনে
ভয়ে সবার প্রাণ ওড়ে।
ভূতের ভয়ে পেশক ছেড়ে এলাম চলে দার্জিলিং।
শৈল রানীর গুমোর ভারি
মাথায় তুষার মুকুট তারি
বাতাস যে তার শীতল হিম।
সুন্দরী তাও দার্জিলিং, সবার সেরা দার্জিলিং। ■

মারিয়া 'ম্যাডাম'

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

রাস্তায় এত দেরি হল যে গজনপুরের 'ফ্যাক্টরি'তে যখন পৌঁছলাম তখন দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে চলেছে। এখানে 'কাইজেন' সম্পর্কে 'লেকচার' দিয়ে, 'ওয়ারকার'দের বোঝাতে হবে ছোট ছোট 'ইমপ্রুভমেন্ট' কিভাবে করতে হয় এবং তা থেকে 'কোম্পানি'র কত বড় বড় মুনাফা হতে পারে...

বাঙালি 'ফ্যাক্টরি ম্যানেজার' থাকায়, খুব একটা অসুবিধা হলনা। উনি বললেন, "আজ একটা আধ ঘণ্টার 'লেকচার' দিয়ে আপনি 'গেস্ট হাউস'এ চলে যান। কাল ভাল করে 'প্ল্যান' করে পরশু থেকে পুরো 'ট্রেনিং' আরম্ভ করা যাবে।" গাড়ি করে এলেও, এতটা পথ আসার পর সত্যিই খুব ক্লান্ত লাগছিল। 'ম্যানেজার' বাবুর 'প্রপোসাল'টা আমি লুফে নিলাম।

'লেকচার' শেষ হতেই, একজন 'পিয়ন' আমাকে 'গেস্ট হাউস'এ পৌঁছে দিল। একটু 'ফ্রেশ' হতে গিয়েই বুঝলাম, এখানকার যা ঠাণ্ডা, তাতে করে আমার পক্ষে এই অবেলায় স্নান করা সম্ভব নয়। 'কেয়ার টেকার'কে একটু নাস্তা লাগাতে বলে, আমি 'টিপয়'এর পাশে রাখা 'ইজি চেয়ার'টাতে সেঁধিয়ে গেলাম। 'গেস্ট হাউস'এর 'বেডরুম' হিসাবে ঘরটা খুব একটা বড় নয়, তবে জিনিসপত্রগুলো খুব সুন্দরভাবে গোছান রয়েছে। ঘরের ভিতর দিকে, এক বিশাল বিছানার ওপর প্রায় মাঝখান বরাবর 'সিলিং' থেকে

মৈত্রী

একটা ঝোলানো 'শেড'এ একটা ছোট 'বাল্ব' জ্বলছে। 'কেয়ার টেকার' বোধহয় 'পাওয়ার সেভ' করার জন্যই দেয়ালের 'টিউব লাইট'টা 'অফ' করে রেখেছে! তার নীচে একটা পেণ্ডুলাম লাগান 'গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লক' টিক টিক করে সময়কে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

সব জানালা বন্ধ, পুরানো দিনের কাঠের পাল্লা, বোধহয় সেই মান্ধাতার আমলেই এদের ভাগ্যে 'পেন্ট' জুটেছিল, তাই জোরের জায়গাগুলো থেকে লাম্বিও খসে গেছে। সেই ফাঁক দিয়ে বেশ একটা শিরশিরে হাওয়া, কেমন যেন একটা মৃদু অনুরণন তুলে ঘরে ঢুকছে। আমার সামনের দেয়ালে একটা 'বুকশেলফ'। 'নাইট ল্যাম্প'টা খাটের মাঝে থাকায়, এদিকে আলোর জোরটা কম। এত ক্ষীণ আলোয় যদিও বইগুলোর 'ফিন'এ লেখা নাম পড়া যাচ্ছে না, তবু এটা বুঝলাম যে প্রায় সবগুলোই ইংরাজী বই। যদিও এই 'কোম্পানি'টা আজকাল খুব দ্রুত 'প্রোগ্রেস' করছে, তবুও মনে হয়না যে এই পাঁড় হিন্দীভাষী এলাকায় এত ইংরাজী পড়ার মত কোন লোক থাকতে পারে, যে এইসব বই পড়ে বা বেছে কিনে এনেছে।

মনে মনে ভাবছিলাম, আগামী সাত দিনে রোজ সন্ধ্যায় এক একটা বই নিয়ে বসে পড়বো। ইতিমধ্যে 'কেয়ার টেকার' পাকোড়া আর চা নিয়ে উপস্থিত। ওকে জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম, "ভাই, ইঁহাপে ইতনা আংরেজি কিতাব কৌন পড়তা হ্যায়? লাতা ভি কৌন?" লোকটা বোধহয় আমার এই প্রশ্নের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলনা, সে খুব আস্তে করে বলল, "আপ্ তো আভী ইঁহা রহেঙ্গে সাব, ধীরে ধীরে সবকুছ জান জায়েঙ্গে। ম্যায় তো ইঁহা কাম করতা হুঁ, বড়া বড়া সাব মেমসাব লোগোঁকা খ্যায়ালোঁ কা বারেমে মুঝে ক্যায়া মালুম!" বুঝলাম লোকটা কিছু

একটা চেপে যাচ্ছে, বা বলতে গিয়েও ভয় পাচ্ছে। ওকে আর না ঘাঁটিয়ে, বিদায় দিলাম।

কিন্তু বেশ একটা রহস্যের গন্ধ যেন আমার নাকে লেগে গেল। ধীরে ধীরে আমি কি জেনে যাব! আর এই ধরধরা গোবিন্দপুরের জীর্ণ ‘গেস্ট হাউস’এ কোন মেমসাহেব মরতে আসবেন! নাস্তা শেষ করে আমি উঠে ‘বুকশেলফ’টার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওপরের তাকটায় চোখ রাখতেই চমকে উঠলাম, পাশাপাশি রাখা প্রায় বারো-তেরোটা বই – সবই ‘সুইসাইড’এর বিষয় লেখা... তার মধ্যে রয়েছে ‘ইমাইল দারক্ষেম’এর ‘সুইসাইড’ থেকে আরম্ভ করে ‘কারলা ফাইন’এর লেখা ‘নো টাইম ট্যু সে গুডবাই...’ পর্যন্ত, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পরে লেখা ‘সুইসাইড’এর ওপর কোন বইই ওখানে নেই। ‘আল আলিয়ারেজ’ এর ‘দ্য সেভেজ গড – অ্যা স্টাডি অফ সুইসাইড’ বইটা হাতে নিয়ে আমি ‘নাইট ল্যাম্প’টার তলায় খাটের ওপর আরাম করে বসলাম। প্রথম পাতাতেই একটা সুন্দর ‘সিগনেচার’ আমার দৃষ্টি কাড়ল... ‘মারিয়া কিলবারগার’... একটু বিস্মিত হয়ে ‘বুকশেলফ’টা থেকে আরও কয়েকটা বই নামিয়ে দেখলাম, সবেতেই প্রথম পাতায় সেই একই ‘সিগনেচার’... সে যা হোক, খাটে ফিরে গিয়ে আমি বইটা পড়তে শুরু করলাম।

সাড়ে সাতটার সময়, ‘কেয়ার টেকার’ এসে বলল, বাইরের ‘ফ্রন্ট রুম’এর ‘ডাইনিং টেবিল’এ আমার ‘ডিনার’ লাগিয়ে দিয়েছে। ওর ছুটি সাড়ে আটটায়, তাই ও আমাকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবার জন্য অনুরোধ জানাল।

খেয়ে এসে, বইটা আবার খুললাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই,

মৈত্রী

'কেয়ার টেকার' আবার এসে জানাল, আজকের মত সে বিদায় নিচ্ছে, আর আমার গরম জল আর কফি ফ্লাস্কে ভরে 'টিপয়'এর ওপর রেখে দিয়েছে। যাবার আগে সে বলল, রাতে যাই হোকনা কেন, আমি যেন কোনমতেই বাইরের দরজা না খুলি।

বাইরের দরজা 'লক' করে আবার খাটে এসে বইটাতে 'কনসেনট্রেট' করতে যাব, হঠাৎই কেমন যেন ফট করে নিদ্রাদেবী আমাকে গ্রাস করলেন। বই পাশে রেখে, একটা লেপ টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। খুব 'লেথারজিক' লাগায় আর 'স্যুইচবোর্ড' পর্যন্ত গিয়ে 'লাইট'টা নেভানো হলনা।

ঠিক কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানিনা, হঠাৎ কিরকম একটা বিদেশী 'সেন্ট'এর গন্ধে আমি জেগে উঠলাম। 'নাইট ল্যাম্প'টা তো জ্বলছিলই, এবং খাটের আশপাশে যে তার তেজ খুব একটা কম তা বলা যায়না – কারণ কিছুক্ষণ আগেই ওই 'লাইট'এর আলোতেই তো আমি বই পড়ছিলাম। চোখ খুলে ঘরের এদিক ওদিকটা দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোথাও ঠিক কিছু বুঝতে পারলাম না। পাশ ফিরে, 'টিপয়'এর দিকটাতে নজর দিতে গিয়েই হল এক বিভ্রাট। মনে হল, কে যেন 'ইজি চেয়ার'টাতে বসে খুব মনযোগ সহকারে কি একটা বই পড়ছে। ভয় ডর আমার বরাবরই একটু কম, তাই সেই মুহূর্তে আমি ভয় না পেলেও, ভয়ানকভাবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে আমি খাট থেকে নেমে 'ইজি চেয়ার'টার দিকে এগিয়ে গেলাম। পরিস্কার দেখলাম, এক 'য়ুরোপীয়ান' নারী 'ইজি চেয়ার'টাতে বসে তন্ময়ভাবে একটা বই পড়ে যাচ্ছেন। আমার উপস্থিতি সম্ভবত তিনি অনুভবও করতে পারেননি...

কয়েক মুহূর্ত এইভাবে কাটার পর আমার খেয়াল হল,

মৈত্রী

‘এন্ট্রান্স’এর দরজাটা বোধহয় কাল ঠিক করে বন্ধ করিনি, ধীর পায়ে সেটা পরখ করতে এগিয়ে গেলাম। আশ্চর্য, দরজাটার তিনটি ছিটকিনিই ভেতর থেকে বন্ধ। তাহলে! এই নারী কি করে ভেতরে এলেন! ভয়ানক কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে আমি আবার সেই ‘ইজি চেয়ার’টার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ততক্ষণে তিনি বইএর একটা পাতা ওলটাতে শুরু করেছেন, আমার উপস্থিতি জানান দিতে আমি একটু গলা ঝাড়ার আওয়াজ দিলাম।

মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন তিনি। ইতিমধ্যে আমার মনের অগাধ বিস্ময় অনেক প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়েছে। চোখাচোখি হওয়াতেই সেই প্রশ্নবানসমূহ আমার মুখ থেকে তীব্র বেগে ছুটে বেরিয়ে এল, বোধহয় আমার অজান্তেই। আমার হিন্দী ভাষার জ্ঞান যৎসামান্য, আর এই ‘লেডি’ কে দেখে ‘য়ুরোপীয়ান’ মনে হওয়ায়, প্রশ্নগুলোও ছিল ইংরাজী ভাষাতেই। সেগুলোর ওপর তিনি কতটা গুরুত্ব দিলেন জানিনা, আমার দিকে এক শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেই বললেন, “‘হাই, আই এম মারিয়া কিলবারগার[$]। হোয়াতস ইওর নেম?’” আমি বললাম, “‘আই এম মোহন রয়। আই হ্যাভ কাম টু দ্য ফ্যাক্টরি অ্যাস এ কনসালটেন্ট’।”

— ‘ও, আই সি..., আর ইউ অ্যা বেঙ্গলি’?

— ‘ইয়েস ম্যাডাম, আই এম অ্যা বেঙ্গলি’।

— ‘অলদ্যো আই এম অ্যা জার্মান’, আমি থোরা থোরা ‘বেঙ্গলি’ বলতে ও বুঝতে পারি।

— তাহলে তো খুব ভাল হল ‘ম্যাডাম’, এই ভিনদেশে মাতৃ-ভাষায় কথা বলার মত অন্তত একজন মানুষকেতো পেলাম।

— ‘এক্সট্রিমলি স্যরি’, আমি কিন্তু মানুষ নই।

[$চরিত্রটি জার্মান হওয়ায়, মারিয়ার উচ্চারণরীতি কে ধরার জন্য ‘ট’, ‘শ’ ‘ড’ ইত্যাদিকে ‘ত’, ‘স’ ‘দ’ রূপে লেখা হয়েছে।]

— 'ইটস অ্যা নাইস জোক, ম্যাডাম'। কিন্তু বাইরের দরজাটা বন্ধ থাকাতেও আপনি এখানে এলেন কি করে? আর কখনই বা এলেন? আমিতো কিছুই বুঝতে পারিনি!

— 'হাই রয়, ইউ আর এগেন মেকিং দ্য সেম মিস্তেক', আমি মানুষ নই। আর তাছাড়া আমিতো এখানেই থাকি। এতাতো আমারই বাড়ি। 'হোয়েন ইউ কেম হিঅ্যার, আই ওয়াজ হিঅ্যার ওনলি'। কি, বিস্বাস হচ্ছেনা?

এতক্ষণে আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সব বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। আমি বুঝতেই পারছি না, কি চলছে? আমি ভদ্রমহিলার কথা পরখ করে দেখার জন্য – আমার ডান হাতটা 'হ্যান্ডশেক'এর জন্য বাড়িয়ে দিলাম। উনি বললেন, "'ও, দিয়ার, আই উদ্ হ্যাভ রিটার্নদ ইউ অ্যা নাইস হ্যান্ডশেক। বাত্, আনফরচুনেতলি, আই কান্ত দু দ্যাত্'। আমি বললাম, "'হোয়াই সো ম্যাডাম! ইজ ইট বিকজ আই অ্যাম এ নেটিভ ম্যান'?

– 'ও, নো দিয়ার, হু সেস ইউ আর অ্যা নেতিভ? আই হোলদ্ ইউ উইথ হাই এস্তীম'। আমি তোমাকে স্রদ্ধা করি, রয়।

– 'দেন, হোয়াই কান্ট্ ইউ শেক হ্যান্ড উইথ মি'?

– 'সিমপ্লি বিকজ', তোমার মত 'সলিদ্' হাত আমার নেই, আমাকে যা দেখছ সবতাই একটা ছায়া। 'ড্যু ইউ ওয়ান্ত তু ভেরিফাই'? দর লাগবেনা তো?

আগেই বলেছি, ভয়ডর আমার চিরদিনই খুব কম। ঘুম থেকে মাঝরাতে উঠে আসলেও ততক্ষণে আমার ঘুম একে-বারেই ছুটে গেছে। আমার মনে হল, হলই বা 'গেস্ট হাউস' এই

ঘরটাতো এখন আমাকেই থাকার জন্য দেওয়া হয়েছে। তার মাঝে, এই রাত-দুপুরে একি রসিকতা! আমি ভিতরে ভিতরে একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লেও, খুব ঠাণ্ডা মাথায়, নম্রস্বরে বললাম, "'ম্যাডাম', ভারতবর্ষের লোক দেখলেই কি আপনাদের তাদেরকে বোকা বলে মনে হয়? বলুন না, হাতে 'গ্লাভস' নেই তাই 'হ্যান্ডশেক' করতে চাইছেন না।"

– 'নো নো রয়, হাউ শুদ আই মেক ইউ আন্দারস্ত্যাণদ্ দ্যাত্ রিয়েলি আই এম অ্যা স্পিরিত'?

এবার আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। আমি ঝুঁকে পড়ে মারিয়া কিলবারগারের হাতটা ধরতে গেলাম। 'ও মাই গড'! এ কি হল! নিজেকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। মারিয়ার হাতটাকে আমার মুঠোর মধ্যে নিতেই দেখলাম, আমার আঙ্গুলগুলো আমারই হাতের ভয়ানক ঠাণ্ডা চেটো স্পর্শ করছে, আর তার একদিক দিয়ে বেরিয়ে আছে মারিয়ার হাতের আঙ্গুলের ডগাগুলো আর অন্যদিকে তার কব্জির ওপরের 'পোরশ্‌ন'টা। এ দৃশ্য যে কি ভয়ানক, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায়না। বেশ কিছুক্ষণের জন্য আমি প্রায় বেবশ হয়ে গেছি, হঠাৎ সম্বিৎ ফিরল মারিয়া 'ম্যাডাম'এরই ডাকে, "'রয়, প্লীজ ডোন্ত বি নার্ভাস'। আমার তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে। আমি তোমার কোন ক্ষতি করবনা। চল খাতে বসে একটু 'গসিপ' করি।"

আমি যেন কেমন বশীভূত বালকের ন্যায় সেই 'য়ুরোপীয়ান' নারীর হাত ধরেই খাটে গিয়ে বসলাম, তারপর আস্তে আস্তে আমার হাতের মুঠিটা খুলে নিলাম। আমি মারিয়া 'ম্যাডাম'এর হাত ছাড়ার পর, উনি একটু ঠিকঠাক করে বসলেন। বিছানার চাদরের কুঁচকে

যাওয়া অংশগুলোকে ঠিক করতে করতে উনি বললেন, "'সি রয়, ইণ্ডিয়ান হোস্টস আর সো কেয়ারলেস'। তোমাকে 'গেস্ত হাউজ অ্যালোত' করেছে, অথচ বিছানার চাদরতা বদলায়নি।" এই 'য়ুরোপীয়ান' নারী না বলে দিলে আমি সত্যিই হয়ত বুঝতাম না, যে 'কেয়ার টেকার' বিছানার চাদরটা বদলে দেয়নি। মারিয়া 'ম্যাডাম' জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার এখানে থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছেনা তো? আসলে এতাতো আমারই বাসস্থান, তাই তুমি আমার 'গেস্ত'। কিছু অসুবিধা হলে জানিও। একবার আমার নাম ভেবে চিন্তা করলেই হবে, তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।"

মারিয়া 'ম্যাডাম' যে আসলে মানুষ নন, তার প্রমাণ তো পেয়েছি, কিন্তু ওনাকে একবারও আমার ভূত বলেও মনে হচ্ছেনা। শুনেছি ভূতেরা মানুষকে কত ভয় দেখায়, মানুষের ক্ষতি সাধন করে, কিন্তু কই, মারিয়া 'ম্যাডাম'তো তেমন কিছুই করছেন না! তাহলে উনি ঠিক কি? কিই বা চান উনি আমার কাছে? আমার ঠাকুরমা বলতেন, "ভূতেরা কখনও ভাল মানুষের ক্ষতি করেনা। ওদের অনেক সমস্যা, তাই জানাতে ওরা ভাল মানুষদের দেখা দেয় – যদি কিছু সুরাহা হয়!" তাহলে কি সত্যি সত্যিই মারিয়া কিলবারগারের কোন বিশেষ সমস্যা আছে? কি সমস্যা হতে পারে? আর আমি জীবনে প্রথম এখানে এলাম, ওনাকে দেখলাম, আমি ওনাকে কি সাহায্যই বা করতে পারি! যখন এইসব সাতপাঁচ চিন্তা আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, নীরবতা ভেঙ্গে মারিয়া 'ম্যাডাম' বললেন, "তুমি কাজকর্ম তো ভালই কর, তাহলে এখনও 'ব্যাচেলর' কেন?" আমি বললাম, "কাজের খাতিরে প্রায় সময়ই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হয়,

তাই আর ওসবের সময় হয়নি। আর যারা বিয়ে করেছে, তারা সবাই কি সুখী হতে পেরেছে? এই তো বেশ চলছে, চলুক না যতদিন চলে...”

– তাহলে কি তুমি ‘কনফারমড ব্যাচেলর’?
– জানি না। তবে এখনও তো জীবনে তেমন কেউ আসেনি, যাকে দেখে মনে হয়, আগে থেকে তার সাথেই চলি...
– সুধু কি চলা, সারীরিক একটা প্রয়োজনও তো থাকে, বিশেষত পুরুষদের।
– তেমন করে তো কখনও ভেবে দেখিনি। আর এ দেশে তো...
– ‘ইউ নো রয়, এভরি ম্যারেজ ইজ লাইক অ্যা লতারি’। কেউ সুখী হয়, কেউ হয়না। তার চেয়ে একা থাকা অনেক ভাল।
– ‘ডিড ইউ ফলো দ্যট ইন ইওর লাইফ’?
– ‘ইয়েস’, কিন্তু অনেক পরে, প্রথমে ভেবেছিলাম আমিও হয়ত ‘ম্যারেজ’এর পর সুখীই হব। কিন্তু তা হয়নি।
– আপনি তো ‘য়ুরোপ’এর, এ দেশে কি করে এলেন?
– সে তো ওনেক কথা। আমি জার্মানির মেয়ে। আমাদের দেশে ‘ফ্যামিলি কোর্ট’এর নিয়ম ওনুযায়ী ম্যারেজের জন্য একজন ‘পার্টনার’এর বয়স আঠারো আর একজনের ষোল হলেই চলে। ‘হ্যানোভার’এ থাকতে ষোল বছর বয়সেই আমার প্রথম বিয়ে হয়, একজন ‘ক্লাসমেত’এর সঙ্গে। ‘ইট দিদ নত্ লাস্ত লঙ্গ’, তারপর ‘য়ুনিভারসিতি’তে আলাপ হয় এই ‘ফ্যাকত্রি’র মালিকের ছেলের সাথে। তেজপ্রতাপ সিং ওখানে পড়তে এসেছিল। সে খেলাধুলায় যেমন ‘এক্সপার্ট’ তেমনই ‘ব্রিলি্যেন্ট স্টাডিস’এ। তার মুখ থেকে ‘ইণদিয়া’র কথা সুনতে সুনতে, তাকে আর এই

দেসকে কেমন যেন ভালবেসে ফেললাম। ওখানকার 'য়ুনিভারসিতি'তেই আমি হিন্দি, সংস্কৃত আর বাংলা সিখি। বাংলা না জানলে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে কি করে বুঝব? কিন্তু, ঐ বয়সে, আলাপ থেকে পেয়ার হতে বেসি সময় লাগে না। তারপর একদিন ওর হাত ধরে চলে এলাম 'ইণদিয়া'য়। আমাকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছিল। কিন্তু 'ম্যান প্রপোসেস বাত্ গদ্ ডিস্পোসেস'। তেজ-প্রতাপের মা কিছুতেই আমাদের বিয়েতে মত দিলেন না। সেষ পর্যন্ত সে আমাকে এই 'গেস্ত হাউস'এ এনে তুলল। সেই থেকে আমি এখানেই থাকি।

– আপনি জার্মানিতে ফিরে গেলেননা কেন?

– কারুকে না জানিয়ে, প্রেমকে মর্যাদা দিয়েই তো চলে এসেছিলাম, আর কোথায় ফিরব? কার কাছে, কিভাবে মুখ দেখাব? আমাকে বিয়ে করলে তেজপ্রতাপ ত্যাজ্যপুত্র হত। অত সিক্ষিত হয়েও সে সম্পত্তির লোভ ছাড়তে পারেনি, তার দাদাজি ছিলেন ইংরাজ আমলের রায়বাহাদুর। অঢেল 'প্রপার্তি'। সারা জীবন বসে আয়েস করে গেলেও তেজপ্রতাপের কোন অভাব হবার সম্ভাবনাই ছিলনা। কিন্তু মা উইল করে লিখে দিয়েছিলেন, কোনদিন যদি সে আমায় বা অন্য কোন বিজাতীয়া মেয়েকে বিয়ে করে, তবে তৎক্ষণাৎ তার সব সম্পত্তি তার বড় আর ছোট দুই ভাইয়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। তেজপ্রতাপ আমাকেও ছাড়তে চায়নি আর তার মা'র সম্পত্তিকেও ধরে রাখতে চেয়েছিল। তাই আস্তে আস্তে আমার সেই প্রেমিক পুরুসের মায়ায় আমি হয়ে গেলাম এই 'গেস্ত হাউস'এর 'হোস্টেস', প্রেমিক বন্ধুতির সাথে

সাথে আমাকে প্রায়ই তার 'বিজনেস পারতনার'দেরও খুসি করতে হত।

বিয়ে না হলেও আমার দু'তি ছেলে হয়েছিল। তারা সুরু থেকেই দিল্লীতে কোন 'চিলড্রেন'স হোম'এ মানুষ হচ্ছিল। বড় ছেলের পাঁচ বছর বয়সের পর আর আমি কখনও তাকে চোখে দেখিনি। ছোততা কখনও কখনও তেজপ্রতাপের সঙ্গে আসত, সেও ঐ ছয় সাত বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর আমি আর তাদের কোন খোঁজ পাইনি। এই বিশাল বাগানবাড়ির 'কম্পাউণ্ড' থেকে বেরোবার 'পারমিসন' ছিলনা আমার। তাই একদিন 'ফ্যান' থেকে দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়লাম।

– কিন্তু আপনি আমাকে এতসব কথা বলছেন কেন? আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

– রয়, আমি জীবনে ওনেক মানুষের সাথে মিসেছি, ভালবেসেছি। কিন্তু বেসির ভাগ মানুষই আমাকে ঠকিয়েছে। কিছু না দিয়েই, বা সুধু দেবার লোভ দেখিয়েই, অনেক কিছু উসুল করে নিয়েছে। তাই আমি এমন একজনকে খুঁজছিলাম, যে খুব সরল, 'চিতিং' করেনা। আমি মানুষের মন পড়তে পারি, যে কোন 'স্পিরিত'এরই সে ক্ষমতা থাকে। সন্ধ্যা নাগাদ তুমি যখন এলে, তখনই আমি তোমার মন পড়ে নিয়েছি। তাই আমি আগে থেকেই জানি যে তুমি 'কনফারমড ব্যাচেলর'। আর আমিও এমনই একজনকে খুঁজছিলাম, যে মানুষতার মনে সেয়ানাপণা, উসুলবাজী আর অন্যকে ঠকিয়ে নেবার চিন্তাগুলো আজও বাসা বাঁধেনি – এত দিনে এই প্রথম আমার এই 'গেস্ত হাউস'এ আমি এমন একজন

মানুষকে দেখলাম। তাই আগামী দিনগুলো আমি তোমার সান্নিধ্যে কাতাতে চাই। 'আই ওয়ান্ত তু বি ইওর রুম মেত অ্যান্ড বেস্ত ফ্রেন্দ। উইল ইউ প্লিজ অ্যাক্সেপ্ত মি?'

এত 'হাম্বল' ভাবে কিছু চাইলে কারুকে কি না বলা যায়? আমিও সেদিন মারিয়া 'ম্যাডাম'কে প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। তখন মনে হয়েছিল, 'স্পিরিট হোক আর মানুষ হোক, 'ফেমিনাইন জেন্ডার' কে কখনও 'রিফিউজ' করতে নেই। তা ছাড়া, রাজা বিক্রমাদিত্যেরও তো বেতাল ছিলেন, তাই ভূতে মানুষে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এতো আর নতুন কিছু নয়। যতদিন 'সার্ভিস'এ ছিলাম, কোন সমস্যাই ছিলনা। 'ন্যাশানাল' তো বটেই, আমি আর মারিয়া ম্যাডাম একসাথে অনেক 'ইন্টারন্যাশনাল' 'ট্যুর'ও করেছি। কোথাও কখনও এতটুকু সমস্যা অনুভব করিনি।

কিন্তু সমস্যাটা এসেছে 'রিটায়ারমেন্ট'এর পরে। আমরা ঠিক থাকলেও, আমাদের প্রতিবেশিনীরা ঠিক নেই, আর তাঁরা ঠিক না থাকায় তাঁদের স্বামীরাও ঠিক নেই। ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি।

আমাদের ঘরদোর ভীষণ টিপটপ রাখেন মারিয়া 'ম্যাডাম'। কখনও কোথাও কিছু জিনিসের মধ্যে অগোছালতার ভাব দেখা যায় না। আর ঘরের মধ্যে ধুলাবালির 'এন্ট্রি' মারিয়া 'ম্যাডাম' 'স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড' করে রেখেছেন। তা দেখে পাশের ফ্ল্যাটগুলোর মহিলারা জ্বলে যান। পিছনে অনেক কথাবার্তা চলে। অনেক রাতেই নাকি আমার ঘরে এক সুন্দরী মহিলাকে দেখতে পাওয়া যায়, নারীকণ্ঠে কথা শোনা যায় ইত্যাদি। কিন্তু আমি জানি, আমি ছাড়া আর কেউই মারিয়া 'ম্যাডাম'কে দেখতে বা তাঁর কথা শুনতে পায়না, পেতে পারেনা। ■